Approved by the D. P. I. of Bengal as Supplementary Readers for Class V of H. E. & Junior High Schools.

রামকৃষ্ণের গল্প

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

ভূমিকা

স্বামী প্রেমঘনানন্দের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। আমাদের দেশের অল্প যে কয়জন সাহিত্যিক সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেশের ছেলেমেয়েদের সেবার ভার গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত "বিবেকানন্দের কথা ও গল্প", "রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প" বইগুলি বহু বাঙালী ছেলেমেয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। আমার বিশ্বাস তারা এই বইটিও পড়ে মুগ্ধ হবে।

গল্পের প্রতি ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ চিরন্তন ও স্বাভাবিক। শুধু ছেলেমেয়েদেরই বা বলি কেন, তাদের অভিভাবকদেরও মনের অবস্থা এবিষয়ে তাদেরই মত। বয়সনির্বিশেষে সকল লোকের কাছেই কথাসাহিত্যের এত আদর; আর সেইজন্যই পৃথিবীতে যাঁরা বড় শিক্ষক ও উপদেষ্টা হয়েছেন, তাঁরা সকলেই গল্পের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। বুদ্ধ, খৃস্ট থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সকল মহাপুরুষই গল্প বলেছেন, তাঁদের ভক্তেরা মুগ্ধ হয়ে সে গল্প শুনেছে এবং শুনে একদিকে যেমন আনন্দ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই জীবনকে সেই গল্পের সুরে বাঁধবার উৎসাহ পেয়েছে।

মনে আছে যখন মিশনারীদের প্রকাশিত খৃস্টের উপদেশপূর্ণ গল্পগুলির সুন্দর সংস্করণ দেখতাম, তখন ভাবতাম আমাদের দেশের মহাপুরুষদের কথিত গল্পগুলিও যদি কেউ এইভাবে ছবি দিয়ে চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করেন তাহলে একটা বড় কাজ হয়। স্বামী প্রেমঘনানন্দ সেই কাজ করছেন বলে শুধু বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে নয়, তাদের অভিভাবকগণও তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন।

প্রিন্সিপ্যাল,
সেণ্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন :
দিল্লী

অনাথনাথ বসু

নিবেদন

রামকৃষ্ণ যখন উপদেশ দিতেন, ছোট ছোট গল্প ও উপমা দিয়ে বলতেন। সেগুলো পড়বার সময় মনে হয়েছিল, যদি কেউ এই গল্পগুলোকে সত্যিকার গল্পের আকারে একটু বড় করে লেখেন, তাহলে ঈসপের গল্পের চাইতেও আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে এগুলোর আদর হবে বেশী।

রামকৃষ্ণ শুধু গল্পের কাঠামোটাই বলতেন। কোন কোন সময় একটা প্যারাতে অথবা একটা বাক্যেই হয়তো গল্পের বিষয়টি বলে গেছেন। বছর কএক আগে আমি এগুলো সংগ্রহ করি এবং ছোটদের উপযোগী করে লিখবার চেষ্টা করি।

যে গল্পগুলো লিখেছিলুম, তার অর্ধেকটি রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প নাম দিয়ে কএক বছর আগে প্রকাশ করা হয়। বইখানি বাংলার সাহিত্যিক মহলে এবং ছোটদের মাঝে আশাতীত সমাদর পেয়েছে এবং অল্পদিনেই পাঁচটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অবশিষ্ট গল্পগুলো একটু পরিমার্জনা করে বর্তমান বইখানি প্রকাশ হচ্ছে। একটি কথা বলা দরকার যে, বইখানির কোথাও কোন বিশেষ ধর্মমত শেখাবার বা প্রচার করবার চেষ্টা করি নি। যাতে এগুলো ধর্মে বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী সকলের পক্ষেই উপযোগী হয়, তারই চেষ্টা করেছি।

এর মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গায় রামকৃষ্ণের বলা পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনীও দেওয়া হয়েছে। গ্রীকদের অথবা অন্যান্য জাতির পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনী আমরা যেমন পড়ি, বিশেষ কোন ধর্ম বিশ্বাসের বা অবিশ্বাসের সংগে সংযুক্ত না করে শুধু গল্প হিসাবে পডবার জন্যেই পাঠকদের কাছে আমি এগুলো পরিবেষণ করছি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ সর্বদাই এই সব গল্প লিখতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর আশীর্বাদ স্মরণ করে তাঁরই পূত নামে বইখানি উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার যে, কামারপুকুর গ্রামের যে বাড়িতে রামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়েছিল, তারই ছবি দেওয়া হয়েছে এ বইএর মলাটে।

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৫১

স্বামী প্রেমঘনানন্দ (অরূপ)

সূচীপত্র

রামকৃষ্ণের গল্প

সরল বালক

এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি ছোট। বাড়িতে ঠাকুর দেবতা আছেন। এই ঠাকুরের প্রতি ব্রাহ্মণের অগাধ ভক্তি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই স্নান করেন, নিজের হাতে ফুল তোলেন, তারপর অনেকক্ষণ ধরে এক মনে ঠাকুরের পুজো করেন।

ব্রাহ্মণ গরীব। তবুও রোজ যা জোটে, তাই রান্না করে আগে ঠাকুরকে [illegible] দেন, তারপর সকলে খান।

একদিন কোন একটা জরুরী কাজে ব্রাহ্মণকে ভোর বেলাই চলে যেতে [illegible] দূরে গাঁয়ে। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি করে ঠাকুরের পুজোটি শেষ [illegible]

মুশকিল হল ভোগ দেবে কে? কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। শেষ কালে তিনি তাঁর ছেলেটিকেই ডেকে বললেন, বাবা, আমাকে এখনই চলে যেতে হচ্ছে বাইরে একটা দরকারি কাজে। সন্ধ্যার পর ফিরব। দুপুর বেলা ঠাকুরকে খাওয়াবার ভার কিন্তু তোমার ওপর। দেখো, ঠাকুর যেন উপোস না থাকেন।

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন।

ছেলের মা মনে করলেন, ব্রাহ্মণ বুঝি ছেলেকে মন্ত্র তন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। দুপুর বেলা রান্না বান্না সেরে তিনি ঠাকুরঘরে ভাত সাজিয়ে দিয়ে ছেলেকে বললেন, বাবা, তুমি এবার যাও ঠাকুরকে খাওয়াও গে। দরজাটা ভেজিয়ে দিও।

বলে তিনি চলে গেলেন পুকুরঘাটে।

ঠাকুরঘরে গিয়ে ছেলে প্রথমেই দরজাটি বন্ধ করে দিলে। তারপর আসনে বসে ভাতের ওপর দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ঠাকুরকে বললে, ঠাকুর খাও। ভাত দেওয়া হয়েছে। সিংহাসন থেকে নেমে এসে চটপট খেয়ে নাও।

ঠাকুর চুপ করে বসে রইলেন।

সে আবার বলতে লাগল, ঠাকুর, আমি মন্ত্র জানি নে, পুজো জানি নে। বাবা আমায় বলে গেছেন, তাই তো তোমাকে খাওয়াতে এসেছি। নেমে এস, শিগগির শিগগির খেয়ে নাও।

পাথরের ঠাকুর হাঁ করে চেয়েই রইলেন। নড়বার চড়বার কোন লক্ষণই তাঁর মাঝে দেখা গেল না।

ছেলেটি মনে করেছে, আমরা যেমন খাই, ঠাকুরও বুঝি সে

রকমই খান। সে বললে, দেরি করছ কেন ঠাকুর। তুমি খাও নি দেখলে বাবা এসে ভয়ানক রাগ করবেন। খাও না ?

ঠাকুর তবুও চুপ।

সে বললে, আমার সামনে খাবে না ? আচ্ছা, এই আমি চোখ বুঁজলুম। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত চটপট নেমে এসে পেট ভরে খেয়ে নাও দেখি। তা হলে বাবা ভারী খুশী হবেন।

অনেকক্ষণ সে চোখ বুঁজে বসে আবার বললে, খেয়েছ তো ? আচ্ছা, আমি তা হলে এবার চাই ?

চোখ চেয়ে সে যা দেখলে তাতে তার কান্না পেলে। দেখলে যেমন ভাতের থালা, ঠিক তেমনটি পড়ে আছে। ঠাকুর যেমন বসেছিলেন, ঠিক তেমনি বসে আছেন।

এই দেখে ছেলেটি আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগল, ঠাকুর, তুমি বড্ড ছেলে মানুষ। বাবা এসে আমাকে যে ভয়ানক বকবেন, তুমি তা বুঝতে পারছ না।

কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগল, তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি। শিগগির ওঠ, খেয়ে নাও, শিগগির খেয়ে নাও।

সরল বিশ্বাসে ভগবান দেখা দেন। ঠাকুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বালক দেখলে পাথরের ঠাকুরের ভেতর থেকে এক অপূর্ব সুন্দর উজ্জ্বল মূর্তি বেরিয়ে এসে ভাত খেতে আরম্ভ করেছেন।

হাতী-নারায়ণ

তখনকার দিনে একটাও ইস্কুল কলেজ ছিল না। তবুও ছেলেরা পড়ত। ছাত্রেরা সব চলে যেত গুরুর বাড়ি। যতদিন পড়া শেষ না হয়, ততকাল গুরুর বাড়িতেই থাকত আর পড়াশুনা করত। ছাত্রেরা সব গুরুর গরু চরাত, ক্ষেতের কাজ করত, বন থেকে কাঠ কেটে আনত, সব রকমের কাজই করত। সংগে সংগে চলত তাদের লেখাপড়া।

এক গুরুর অনেক শিষ্য ছিল। তিনি শিষ্যদের খুব ভালবাসতেন। নরোত্তমকে ডেকে একদিন তিনি উপদেশ দিলেন, বাবা নরোত্তম, সকলের মাঝেই নারায়ণ আছেন। এইটিই জ্ঞানের সার কথা।

নরোত্তম একজন ছাত্র। খুব ভক্তি করে সে গুরুর উপদেশ শুনতে লাগল। গুরু বললেন, এই মানুষ গরু হাতী ঘোড়া কীট পতংগ, প্রত্যেকের মাঝেই নারায়ণ রয়েছেন। সবাই নারায়ণ।

কথাটা নরোত্তমের ভারী ভাল লাগল।

গুরু বললেন, বাবা নরোত্তম, সকলেই নারায়ণ, এই জেনে তুমি সবাইকে নমস্কার করো।

নরোত্তম কাঠ কাটতে বনে চলেছে। পথে দেখলে একটা কুকুর শুয়ে আছে। নরোত্তম বললে, কুকুর, তোমার ভেতর নারায়ণ রয়েছেন। তুমি নারায়ণ। তোমাকে নমস্কার।

বনে গিয়ে একটা শেয়ালের সংগে দেখা। শেয়ালটি ভয় পে

পালিয়ে গেল। নরোত্তম বললে, কেন নারায়ণ, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তুমি শেয়াল-নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার।

এই ভাবে পথে ঘাটে যার সংগেই দেখা হয়, তাকেই নারায়ণ মনে করে মনে মনে সে প্রণাম করে।

একদিন সকালবেলা নদী থেকে গুরুর জন্যে কলসি ভরে জল নিয়ে আসছিল নরোত্তম। হঠাৎ পথে একটা গোলমাল শুনতে পেলে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনতে পেলে—পালাও পালাও, পাগলা হাতী আসছে, পালাও পালাও।

নরোত্তম চেয়ে দেখলে লোকজন যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। কি করবে, সে তাই ভাবছে। অমনি দূরে মস্ত বড় একটা হাতী দেখা গেল। ওপর থেকে মাহুত চীৎকার করছে—পালাও, পালাও।

নরোত্তম ভাবলে, ওঃ, এই কথা। হাতীকে কেন আমি ভয় করব? হাতীর মধ্যে নারায়ণ রয়েছেন, হাতী তো নারায়ণই। তাঁকে দেখে ভয় পাব কেন?

হাতী তখন খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে। মাহুত চীৎকার করে বললে, ও ঠাকুর, শিগগির পালাও, শিগগির ছুটে পালাও।

মাহুতের কথায় সে কান দিলে না। কলসিটি নামিয়ে রাস্তার এক পাশে রাখলে।

হাতী তখন একেবারে সামনে এসে পড়েছে।

হাত জোড় করে নরোত্তম বলতে লাগল, প্রভু, তুমি নারায়ণ। তোমাকে নমস্কার। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো—

চোর জেলে

একটা বাগানবাড়ীতে মস্ত বড় একটা পুকুর ছিল। তাতে মাছ ছিল অনেক। একটি জেলে একদিন কি কাজে সেই বাগানে এসেছিল। পুকুরে মাছ কেমন আছে, জেলেরা দেখলেই বুঝতে পারে। এই পুকুরে যে অনেক মাছ, জেলেটির তা বুঝতে বাকী রইল না। তার মনে ভারী লোভ হল।

রাত্রিতে ভাল একখানি জাল নিয়ে সে চুপি চুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঐ বাগানে ঢুকে পড়ল। দারোয়ান তখন পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু যেই পুকুরে জাল ফেলা, অমনি সেই শব্দে দারোয়ান গেল জেগে আর 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। দারোয়ানের চেঁচামেচিতে বাগানের আর আর লোকজন জেগে উঠল। সংগে সংগেই আলো জ্বেলে লাঠি হাতে সবাই চোর খুঁজতে বেরুল।

জেলে দেখলে পালাবার আর পথ নেই। কি করে? তাড়াতাড়ি জালটি জলের মাঝে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার উপায় দেখতে লাগল। পালাবার কোন পথই নেই দেখে শেষকালে একটা ঝোপের মাঝে ঢুকে মরার মত পড়ে রইল।

বাগানের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে পেলে না। দারোয়ান বললে, না বাবু, নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে। আমি স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম।

সদরে আর চারপাশের পাঁচিলের আশে পাশে পাহারা বসিয়ে

বাবু চলে গেলেন। ঝোপের ভেতর শুয়ে শুয়ে জেলে সব দেখছে, সব শুনছে, আর মনে মনে ভারী ভাবিত হয়ে পড়ছে।

পালাবার পথ বন্ধ, আবার ভোর হতেও দেরি নেই। জেলে ঝোপের ভেতর বসে বসে দুর্গা নাম জপ করছে। শেষকালে তার মাথায় এক বুদ্ধি গজাল। এক জায়গায় খানিকটা ছাই পড়ে ছিল। তারই খানিকটা নিয়ে জেলে বেশ করে সমস্ত গায়ে মাখল। তার-পর কৌপীন পরে এক বড় গাছের তলায় আসন করে চোখ বুঁজে বসে রইল।

ভোর হতে না হতেই লোকজন সব হই হই করে চোর খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। পুকুর পাড়ে ঝোপের মাঝে গাছের ওপর তন্ন তন্ন করে তারা খুঁজলে। কিন্তু চোর পাওয়া গেল না।

শেষকালে দেখা গেল দারোয়ানের ঘরের পাশে মস্ত বড় এক গাছের তলায় বসে আছেন এক সাধু, ভস্মমাখা ধ্যানস্থ। সকলেই এসে সাধুকে প্রণাম করলে এবং ঘর থেকে ফল মিষ্টি সব এনে সাধুর সামনে উপহার দিলে।

বাগানে একজন মস্ত বড় সাধু এসেছেন, এ কথা সংগে সংগেই পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সব দলে দলে ফল দুধ পয়সা নিয়ে সাধু দেখতে এল। সকলে ভক্তি ভাবে সাধুকে প্রণাম করতে লাগল। কেউ কেউ বা সাধুর কাছে উপদেশ চাইলে।

জেলে ভারী সাবধান। কথা বললেই ধরা পড়বার ভয় আছে, তাই সে চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইল। কোন কোন সাধু আছেন,

যাঁরা কথা বলেন না। তাঁদের বলে মৌনী সাধু। সবাই ভাবে উনি বুঝি মৌনী সাধু।

তাতে লোকের ভক্তি আরও বেড়ে গেল।

জেলে তখন মনে মনে ভাবছে, আমি চোর, মাছ চুরি করতে এসে ধরা পড়বার ভয়ে সাধু সেজেছি। আমারই যদি এত আদর এত সম্মান, তবে সত্যিকার সাধু হলে না জানি কি হবে!

কাউকে কোন কথা না বলে তখনই সে চলে গেল বাগান থেকে। বাড়িও গেল না, জালের খবরও নিলে না, বেরিয়ে পড়ল সে সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রমের দিকে।

রাজা বড় না পুরুত বড়

জয়পুর রাজপুতানার একটা বিখ্যাত রাজ্য। গোবিন্দজী আছেন সেখানকার ঠাকুর। সেখানকার লোকেরা বলে গোবিনজী। এই গোবিনজীর খুব নাম দেশে-বিদেশে। রাজার ঠাকুর, তাই রাজ্যশুদ্ধ সবাই এঁকে খুব ভক্তি করে। তাঁর সেবা পূজার আড়ম্বরও খুব।

একবার একটা বিশেষ দরকারে গোবিনজীর পুরুতদের ডাকালেন রাজা। পুরুতরা বললেন, কি? আমরা যাব না। আমরা রাজার চাকর নয়, ভগবানের চাকর। রাজার দরকার থাকে আমাদের কাছে আসবে, আমরা যাব না।

রাজার হুকুম অমান্য করে, এরকম সাহস রাজ্যে কারুরই নেই। রাজবাড়ির লোক অবাক হয়ে রাজার কাছে গিয়ে সব জানালে। রাজা শুনে তো চটে লাল।

কিন্তু উপায় কি? এদের ধরে এনে অন্যান্য লোকদের মত শাস্তি দেওয়াও মুশকিল। তাহলে পুজোই বা চলবে কি করে? অথচ ওদের এত তেজ সহ্য করাও যে রাজার পক্ষে দারুণ অপমান।

শেষকালে মন্ত্রীর ডাক পড়ল। সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বুড়ো মন্ত্রী ভাবতে লাগলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, মন্ত্রী, কি করা যায়?

মন্ত্রী জবাব দিলেন, তাইতো, কি করা যায়?

রাজা বললেন, মন্ত্রী, এর একটা উপায় কিন্তু আপনাকে বের করতেই হবে।

মন্ত্রী জবাব দিলেন, রাজা, এ বড় ভীষণ সমস্যা। এদের ধরে এনে শাস্তি দেওয়াও চলে না।

রাজা জানতেন সবই, তবুও প্রশ্ন করলেন, কেন ?

—কারণ, একে এরা গোবিন্দজীর পুরোহিত, মন্ত্রী আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, তাতে অনেকে আবার এদের গুরু করেছে। শাস্তির কথা শুনলে প্রজারা যে ক্ষেপে উঠবে।

বাদলা দিনের আকাশের মত রাজার মুখখানা কালো আর গম্ভীর। বললেন, তাই বলে রাজা হয়ে এদের এত তেজ সহ্য করব নাকি ?

সাদা দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে মন্ত্রী বললেন, রাজা, আমাকে কিছুদিন সময় দিন। আমি এর একটা বিহিত করছি।

খুশী হলেন রাজা। বললেন, আচ্ছা, সময় দিচ্ছি। কিন্তু পুরুতদের বিষদাঁত একেবারে ভেঙে দিতে হবে চিরকালের জন্যে।

পুরুতদের চিন্তা মাথায় নিয়ে মন্ত্রী বাড়ি ফিরে গেলেন। এ রকম বিপদে মন্ত্রী কখনও পড়েন নি। এক জায়গায় বসে মন্ত্রী চুপটি করে ভাবতে লাগলেন। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। দাস-দাসীরা এসে কতবার ডাকলে। কোন সাড়া নেই।

শেষকালে মন্ত্রীর পরিবারের কাছে খবর গেল। তিনি এসে দেখেন চুপটি করে বসে মন্ত্রী নিজের দাড়িতে অবিরাম হাত বুলচ্ছেন আর চোখ বুঁজে কি ভাবছেন।

পরিবার বললেন, হয়েছে এখন ওঠ। খাওয়া দাওয়া সেরে যত ইচ্ছে ভেবো। এখন ওঠ দেখি।

বলেই তিনি মন্ত্রীকে একেবারে হাত ধরে তুলে দিলেন।

মন্ত্রী হেসে বললেন, পেয়েছি পেয়েছি।

পরিবার বললেন, পেয়েছ না পেয়েছে? তোমাকে ভূতে পেয়েছে। নাও এবার স্নান করে খাওয়া দাওয়াটি শেষ কর দিকি, তারপর পেয়েছ কি তোমাকে পেয়েছে, তার বিচার করো।

আর উপায় নেই। মন্ত্রীকে উঠতে হল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি গেলেন গোবিনজীর মন্দিরে। পুরুতদের সংগে বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করতে লাগলেন। বললেন, বুড়ো হয়ে গেছি। রাজার কাজ আর ভাল লাগে না। আপনাদের কাছে তুটো ধর্মকথা শুনতে এসেছি। আমাদের শেষের দিনের তো আর বাকী নেই।

পুরুতরা খুব খুশী। তাঁরা মন্ত্রীকে আদর করলেন ও নানা ধর্ম উপদেশ দিলেন। দেখতে না দেখতে পুরুতদের সংগে মন্ত্রীর খুব ভাব হয়ে গেল।

নিজে যেচে রোজই মন্ত্রী পুরুতদের এঁকে ওঁকে সংসারের অভাব অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং প্রায় রোজই নানা রকম উপহার পাঠাতে লাগলেন।

পুরুতরা বলাবলি করতে লাগলেন, বড় ভাল লোক আমাদের মন্ত্রী। সত্যি ভক্ত লোক।

যে পুরুতের সংগে মন্ত্রীর সব চাইতে বেশি ভাব ছিল, তাঁকে একদিন মন্ত্রী ধরে বসলেন, ঠাকুর মশাই, আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

—সে কি কথা মন্ত্রী? পুরুত জবাব দিলেন, আমি বিয়ে করব না।

তখনকার দিনে গোবিনজীর পুরুতদের কেউই বিয়ে করত না।

মন্ত্রী বললেন, আপনি নিজের হাতে রান্না করে খান। আপনার কত কষ্ট। আচ্ছা, সেকালের ঋষিরাও তো সব বিয়ে করেছিলেন। বেশ, আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন যে বিয়ে করা পাপ, অথবা বিয়ে করলে ধর্ম হয় না, তাহলে আমি আর কিছু বলব না। যদি না বোঝাতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে বিয়ে করতে হবে। আমি মেয়ে ঠিক করে রেখেছি, অতি চমৎকার একটি মেয়ে।

পুরুত ঠাকুর কিছুতেই মন্ত্রীকে বোঝাতে পারলেন না। মন্ত্রী বললেন, ঠাকুর আমি কোন কথাই শুনব না। আমি আজই সব ঠিক করে ফেলব।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, দেখুন খরচপত্র লোকজন এ সবের জন্যে আপনি মোটেই ভাববেন না। আমি তো রয়েছি। আপনাদের একটু সেবা যদি করতে পাই, তাহলে জানব আমার ধনের সদ্‌ব্যয় হল।

বিয়ে হয়ে গেল। মন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে খুব ঘটা করে বিয়ে দিলেন। তারপর মন্ত্রী সারা রাজ্য খুঁজে বাছা বাছা সুন্দর সুন্দর মেয়ে আনতে লাগলেন আর পুরুতদের এক এক জনকে ধরে তাঁদের সংগে বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রথম প্রথম একটু বেগ পেতে হল বই কি? কিন্তু যতই বিয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল, ততই মন্ত্রীর পক্ষে সুবিধে হতে লাগল। কারণ যাঁরা বিয়ে করলেন, তাঁরাও আবার অন্যদের বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন।

অল্প দিনের মাঝেই সকলেরই বিয়ে হয়ে গেল। পুরুতদের যা

যা দরকার ছিল, মন্ত্রী একে একে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার আগের মতই রাজসভায় গিয়ে বসতে শুরু করলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, মন্ত্রী, কি খবর ?

হেসে জবাব দিলেন মন্ত্রী, খবর খুব ভাল। আপনি যে কাজের ভার আমার ওপর দিয়েছিলেন, সেটি সম্পূর্ণ করে এসেছি।

—কি করেছেন শুনি। কৌতূহলী রাজা প্রশ্ন করলেন।

—কি করেছি, এখন তা বলব না। মন্ত্রী জবাব দিলেন, অল্প দিনের মাঝেই আপনি নিজের চোখে তার ফল দেখতে পাবেন। পুরুতদের আর ডাকতে হবে না। নিজেরাই এবার তাঁরা আপনার কাছে আসবেন।

দিন কএক পরেই একজন পুরুত রাজসভায় এসে হাজির। রাজা বললেন, পুরুত ঠাকুর, প্রণাম। কি সংবাদ ?

পুরুত বললেন, সংবাদ সব কুশল, রাজা। আপনার মত ধার্মিক রাজার রাজ্যে কখনও অকুশল হতে পারে না। এলুম অনেক দিন রাজদর্শন হয় নি। তারপর গোবিনজীর প্রসাদী দুটি তুলসী পাতাও এনেছি আপনার জন্যে।

তুলসী পাতা মাথায় নিয়ে রাজা প্রণাম করলেন।

তারপর একথা সেকথার পর পুরুত জানালেন, তাঁর থাকবার ঘরটি ভাঙতে আরম্ভ করেছে। মেরামত দরকার। কিন্তু টাকা নেই।

রাজা সবই ব্যবস্থা করে দিলেন।

তার দুদিন পর আর একজন পুরুত এসে উপস্থিত। বললেন, শাস্ত্রেই বলেছে রাজদর্শন মহাপুণ্যের। অনেক দিন তাঁর ভাগ্যে রাজদর্শন হয় নি, তাই এলেন।

তারপর একথা সেকথার পর জানালেন, তাঁর স্ত্রী একটি ব্রত করবেন। কিন্তু অর্থাভাব।

রাজা তাঁকেও অনেক টাকা দিলেন।

তারপর থেকে প্রায় নিত্যই পুরুতরা রাজার কাছে আসতে লাগলেন। আজ ছেলের ভাত, কাল ছেলের পৈতে, পরশু মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি। তার ওপর নিত্যকার নানা অভাব অভিযোগ ঝগড়া বিবাদ এসব তো আছেই।

মন্ত্রীর দিকে চেয়ে রাজা হাসেন, মন্ত্রীও রাজার পানে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসেন।

কে খেতে দেয়

দারুণ কলেরা রোগে রামদাসের মা ও বাবা যখন একই দিনে মারা গেলেন, রামদাস তার মাকে অনেক ডাকাডাকি করলে. তারপর বাইরের দাওয়ায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেটে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ল। দু বছরের ছেলে, তাই সেদিনের কথা তার একটুও মনে নেই।

মা বাবা ছাড়া সংসারে তার কেউ ছিলেন না। কলেরার ভয়ে গ্রামের মেয়ে পুরুষ একজনও সে দিকে পা বাড়ালে না। রামদাস জেগে উঠে আবার কাঁদতে লাগল।

একজন সাধু সে পথে যাচ্ছিলেন। পাড়াপড়শীদের মুখে সব শুনে তিনি রামদাসকে কোলে করে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন। গ্রামের একেবারে শেষ সীমায় নদী। নদী পেরিয়ে গিয়ে বনের ধারে পাহাড়ের কোলে সাধুর আশ্রম। তার আশে পাশে কোথাও লোকজনের বসতি নেই।

সাধুর যত্নে রামদাস ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। মা বাবার কথা সে সাধুর কাছ থেকে শুনেছে। তাদের চেহারা, তাদের কথা রামদাস মনে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই তার মনে আসে না। নদীর ওপারে গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসে। দূর আশ্রম থেকে রামদাস দেখতে পায় তাদের অস্পষ্ট মূর্তিগুলি। মনে মনে সে ভাবে, তার মাও হয়তো ওদের মতই একজন ছিলেন।

রোজ সকালে সাধু গ্রামে বেরিয়ে যান, ভিক্ষে করে আনেন, তারপর দুজনে রান্না করে খেয়ে দেয়ে আশ্রমের কাজে মন দেন। সকাল বেলা একা আশ্রমে বসে রামদাস আপন মনে লেখা পড়া করে।

রামদাস তখন অনেকখানি বড় হয়েছে। একদিন সাধু তাকে ডেকে বললেন, বাবা রামু, আমার শরীরটি বড্ড খারাপ হয়েছে। আমি আজ ভিক্ষেয় যেতে পারব না। থলেটি নিয়ে তুমি একবার ঘুরে এস।

তারপর সাধু তাকে শিখিয়ে দিলেন লোকের বাড়ি গিয়ে কোথায় দাঁড়াতে হয়, কি বলে ভিক্ষে চাইতে হয়, এই সব। থলেটি কাঁধে ঝুলিয়ে রামদাস ভিক্ষে করতে গ্রামে চলল।

সাধুর কোলে চড়ে গ্রাম থেকে সে যেদিন বেরিয়ে এসেছিল, তারপর আর সেখানে যায় নি।

একটি বাড়িতে গিয়ে রামদাস ভিক্ষে চাইলে। একটি বউ বেরিয়ে এসে তাকে ভিক্ষে দিলে। সুন্দর ছোট ছেলেটিকে দেখে বউ অবাক্ হয়ে গেল। সে তার শাশুড়ীকে ডেকে আনলে।

রামদাস আর কখনও মেয়েকে কাছে দেখে নি। বোকার মত সে একটা প্রশ্ন করে বসল বউকে। তার কথা শুনে বউ মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল। শাশুড়ীও হাসতে লাগলেন।

রামদাস কিছুই বুঝতে পারলে না। হাঁ করে সে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। শাশুড়ী তখন তার মা বাবার কথা, আশ্রমের কথা একে একে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন। তারপর বললেন, বাবা, তুমি যেমন একদিন তোমার মায়ের কোলে এসেছিলে, সেই রকম ছোট

ছোট খোকা খুকুরা আমার এই বউমার কোলে আসবে। তুমি এখন ভাত খাও। কচি কচি ছেলে মেয়েরা তো আর ভাত খেতে পারে না। তাই ভগবান মার বুকে দুধ দেন। সেই দুধ খেয়েই ছেলেমেয়েরা বাঁচে।

রামদাস বললে, আমি তোমাদের ছেলেমেয়ে দেখব।

শাশুড়ী আবার বুঝিয়ে বললেন, বাবা, ছেলেমেয়েরা এখনও আসে নি। অনেক দিন পরে আসবে। এসে খাবে কি? তাই আগে থেকেই ভগবান তাদের খাবার রেখে দিয়েছেন মার বুকে।

রামদাস বললে, বটে। কবে ছেলে আসবে তার ঠিক নেই। কিন্তু ভগবান আগেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

কি জানি কেন সে একটু সময় ভাবলে, তারপর ভিক্ষের ঝুলির সমস্ত চাল বের করে তাদের দাওয়ায় রেখে বললে, মা, আমি তাহলে এগুলি নিয়ে যাচ্ছি কেন? ভগবান তাহলে আমার খাবার ব্যবস্থাও করেছেন।

এই বলে সে শুধু হাতেই চলে গেল।

নারায়ণ

লক্ষ্মী আর নারায়ণ স্বামী-স্ত্রী তুজনে বৈকুণ্ঠে বাস করেন। এক দিন তুজনে বসে গল্প করছেন, হঠাৎ নারায়ণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে লক্ষ্মীকে কিছু না বলেই উঠে বেরিয়ে গেলেন। এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে লক্ষ্মী তাঁকে জিজ্ঞাসাও করতে পারলেন না কোথায় যাচ্ছেন।

একটু পরেই নারায়ণ ফিরে এলেন।

লক্ষ্মী বললেন, কি হয়েছিল ? অমন ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলে কেন ?

নারায়ণ বললেন, আমার একটি ভক্ত মহা বিপদে পড়েছিল। তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলুম।

লক্ষ্মী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, তাহলে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে ?

নারায়ণ বলতে লাগলেন, আমার একটি ভক্ত পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার নাম করতে করতে সে এত তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল যে বাইরের হুঁশ তার বড় একটা ছিল না। এদিকে পথের পাশে ধোপারা কাপড় শুখাতে দিয়েছিল। ভক্তটির অত খেয়াল নেই। চলতে চলতে কতকগুলো কাপড় সে পায়ে মাড়িয়ে দিলে। তাই

দেখে ধোপারা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাকে রক্ষা করবার জন্যেই আমি ছুটে গেলুম।

লক্ষ্মী বললেন, তবে ফিরে এলে যে?

হেসে নারায়ণ বললেন, দেখলুম ধোপারা যেই লাঠি তুলেছে, ভক্তটিও অমনি একখানি ইট তুলেছে। তাই দেখে আমি ফিরে এলুম।

বেগুনওলা, কাপড়ওলা ও জহুরী

এক জমিদার তাঁর দিদিমার সম্পত্তি পেয়েছিলেন। সিন্ধুক খুলে তিনি এক টুকরো হীরে পেলেন। হীরের টুকরোটা একটা নীল রঙের কাগজে মোড়া ও খুব যত্ন করে তোলা ছিল।

জমিদারের ইচ্ছে হল হীরের সত্যিকার দাম কত একবার যাচাই করে নেবেন, তিনি তাঁর চাকরকে ডাকলেন। হীরেটি তার হাতে দিয়ে বললেন, এর বাজার-দর কত একবার যাচাই করে আয় দিকি। আচ্ছা, দাঁড়া।

একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর হেসে বললেন, এক কাজ কর। প্রথমে যা বেগুনওলার কাছে। সে কি বলে আমাকে এসে বলিস।

চাকরটি চলে গেল।

এক বেগুনওলার কাছে গিয়ে সে বললে, ভাই, এই জিনিসটি তুমি কিনবে ?

· খানিকটা নেড়ে চেড়ে দেখে বেগুনওলা বললে, আচ্ছা কি দাম চাও বল।

চাকর জবাব দিলে, এ সব জিনিস কি আমি কখনও বিক্রি করেছি যে তোমাকে দাম বলব ? আমি কিছুই জানি নে ভাই। তুমি কি দিতে পার তাই বল।

অনেক ভেবে চিন্তে হিসেব করে বেগুনওলা বললে, আমি এর দামে তোমাকে ন সের বেগুন দিতে পারি।

চাকর বললে, আচ্ছা ভাই, আমি একবার বাড়িতে জিজ্ঞেস করে আসি।

জমিদারের কাছে এসে চাকর সব জানালে। শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, আবার তুই যা বেগুনওলার কাছে। বলিস দশ সের বেগুন দিলে তুই মালটা ছেড়ে দিতে পারিস।

চাকর গিয়ে বললে, ভাই, তুমি আর একটু দাম দাও। ন সের বড্ড কম হয়। তুমি দশ সের বেগুন দাও, আমি তোমাকে মালটা দিয়ে যাই।

বেগুনওলা ভাবলে নিশ্চয়ই এ জিনিসটার অত দাম নয়। দাম নয় বলেই তো চাকর আবার ঘুরে এসেছে আর ফাঁকি দিয়ে আরো কিছু আদায় করবার মতলব করছে। বললে, না ভাই, আমি আগেই তোমাকে বেশী দাম বলে ফেলেছি। আমার কথা বিশ্বাস না হয় বাজারে তুমি যাচাই করে দেখ। একটি বেগুনও আমি এর বেশী দিতে পারব না। ইচ্ছে হয় দিয়ে যাও।

চাকর চলে গেল।

জমিদার বললেন, একবার কাপড়ওলার কাছে নিয়ে যা।

কাপড়ওলার কাছে গিয়ে চাকর বললে, বাবু এ জিনিসটি নেবেন?

—দেখি দেখি কি এনেছিস?

হাতে নিয়ে কাপড়ওলা অনেক নেড়ে চেড়ে দেখলে তারপর বললে, জিনিসটা দামী আছে। গয়না টয়না হতে পারে। তুই কোথা পেলি?

—সে কথায় কি দরকার বাবু? আপনি কিনবেন কিনা বলুন।

কাপড়ওলা বললে, আমি এর জন্যে ৯০০ টাকা দিতে পারি।

চাকর বললে, বাবু, আপনি বড্ড কম বলছেন। এর দাম ঢের বেশী। আচ্ছা আর কথার দরকার নেই, হাজার পুরো করে দিন, জিনিসটা আপনাকে দিয়ে যাই।

হীরেটি আরও একটু নেড়ে চেড়ে কাপড়ওলা কি ভাবলে। তার পর বললে, না বাপু, আমি আগেই দাম বেশী বলেছি। আর একটা পয়সাও আমি বেশী দিতে পারব না। তোর ইচ্ছে হয় তো রেখে যা।

—আচ্ছা বাবু, বাড়িতে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

চাকরের মুখে জমিদার সব শুনে হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা, এবার জহুরীর কাছে যা দিকি।

চাকর গেল জহুরীর দোকানে।

হাতে নিয়েই জহুরী বললেন, বাঃ রে, এ জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। আমি লাখ টাকা দেব। এটি আমার চাইই।

তোমার কি হল

ছুটি ভাই ছিল। বড় ভাই বাড়ি ছেড়ে বনে চলে গেল। সেখানে গিয়ে নানা রকম করে কঠোর তপস্যা করতে লাগল। শীতের রাত্রে বিলের ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে সে বসে থাকত, আবার চৈত্র মাসের ছুপুর রোদে চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকত। এ রকম করেই সে তপস্যা করতে লাগল।

ছোট ভাই বাড়ি রয়ে গেল। সে বিয়ে করলে এবং আরো দশজনের মতই সংসারের কাজকর্ম করতে লাগল।

অনেক বছর কেটে গেল। সাধুরা বলেন অনেক কাল যদি কেউ কঠিন কঠিন তপস্যা করে, তা হলে তার কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তি হয়। যেমন, সে ইচ্ছে করলে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে, আগুন খেয়ে ফেলতে পারে, এই সব।

বড় ভাইটিরও এরকম কতকগুলো শক্তি হল। সে মনে করলে সে একজন মস্তবড় সাধু মহাত্মা হয়ে গেছে। সে ভাবলে, তাহলে গ্রামে গিয়ে ছোট ভাইটিকে আর গ্রামের লোককে তো একবার তাক লাগিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

যেই ভাবা সেই কাজ।

বহুকাল পরে দাদাকে এ ভাবে আসতে দেখে ছোট ভাই তো মহা খুশী। বাড়িতে যেন উৎসব লেগে গেল। একজন ছুজন করে গ্রামের লোকও এসে জমা হতে লাগল সাধুকে দেখবার জন্যে।

ঠিক সে সময় তাদের বাড়ির সামনে দিয়েই একটা হাতী যাচ্ছিল।

দাদা দেখলে মহা সুযোগ। লোকও জমেছে মন্দ নয়। আর হাতীটিও যখন একেবারে হাতের কাছে এসে পড়েছে। দাদা তখনই উঠে পড়ল। খানিকটা ধুলো হাতে নিয়ে তাতে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়লে। তারপর সেই মন্ত্রপড়া ধুলো হাতীর গায়ে ছুঁড়ে মারলে।

সমস্ত লোক হাঁ করে দেখছে সাধুর কাণ্ড।

দেখতে না দেখতে হাতীটা মাটিতে পড়ে ছটফট করে মরে গেল। গ্রামের লোকের মধ্যে হই চই পড়ে গেল। কে কার আগে সাধুর পায়ে মাথা ছোঁয়াবে, তার জন্য রীতিমত ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল। ছোট ভাইটি কিন্তু চুপটি করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হল না যে সে খুব খুশী হয়েছে।

সাধু ভাবলে, পরের হাতী এ ভাবে মেরে ফেলেছি দেখে ভায়া বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছে মনে মনে। আচ্ছা, এবার দেখ।

সে আবার খানিকটা ধুলো হাতে নিলে, তাতে আবার মন্ত্র পড়লে, তারপর আস্তে আস্তে ছিটিয়ে দিলে হাতির গায়ে।

সাধুর আশ্চর্য শক্তির কথা ইতিমধ্যে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দলে দলে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সবাই এসে দাঁড়াল সাধুর চার-পাশে। লোকের ভিড় লেগে গেল।

মরা হাতী ধীরে ধীরে চোখ চাইলে, কানদুটি নাড়লে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল নিজের পথে। হাতী এমনভাবে চলে গেল যেন কিছুই হয় নি। ছেলে মেয়ে ছোট বড় সবাই আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। সাধুর মনও মহা খুশী।

হঠাৎ ছোট ভাইএর ওপর চোখ পড়তেই মনটা তার কেমন

হয়ে গেল। দাদা এত বড় অদ্ভুত শক্তির খেলা দেখালে, গ্রাম শুদ্ধ সবাই ধন্য ধন্য করছে আর ছোটর মনে এতটুকুন আনন্দের ভাবও দেখা যাচ্ছে না। সাধু ভাবলে, ভাইটি আমার তাহলে সংসারের কীট হয়ে একেবারে রসাতলে গেছে। সংসারী হলে মানুষ এ রকমই হয়। সাধুর তপস্যার শক্তি বোঝবার মন এর কোথায়?

সাধু ভাবলে, আচ্ছা, এবার যা দেখাব, তাইতে ভায়া আমার অবাক্ না হয়ে পারবে না।

বাড়ির সামনেই মস্ত বড় নদী। সাধু তার ছোট ভাইকে ডাকলে, চল আমার সংগে একটু।

সাধু চলল, পেছনে চলল ছোট ভাই, তার পেছনে চলল গ্রামের লোকের বিরাট মিছিল। নদীতে পৌঁছেই সাধু জলের ওপর হেঁটে চলল। ভাইটি সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রামের লোকের আনন্দ কোলাহলে সে জায়গাটি ভরে উঠল।

খেয়া নৌকাটি ছেড়ে যাচ্ছে দেখে ছোট ভাই তাড়াতাড়ি একটি পয়সা ফেলে নৌকাতে উঠে বসল; সাধু ও-পারে পৌঁছবার অল্প সময় পরেই ভাইটিও সেখানে গিয়ে হাজির।

দাদা তখন হেসে হেসে ভাইকে বললে, দেখলি? আমার এত দিনের কঠোর তপস্যার ফল দেখতে পেলি?

বলেই সাধু নদীর এ পারের জনতার দিকে একবার চাইল।

ভাই জবাব দিলে, কি জানি দাদা, আমি মূর্খ মানুষ। তোমার ধর্মের ও তপস্যার কথা আমি কি বুঝব। আমার মনে হচ্ছে—তুমি এত বছর তপস্যা করে নদী পেরিয়ে এলে। আমিও একটা পয়সা

দিয়ে নদী পেরিয়ে এসেছি। তোমার এত তপস্যার দাম একটি পয়সা বই তো নয় দাদা ?

এ কথায় সাধু ভয়ানক চটে গেল, কি, আমার এত কঠোর তপস্যার দাম এক পয়সা ? তাহলে হাতীটাকে মারলুম, আবার তক্ষুণি বাঁচিয়ে তুললুম—

দাদার কথা শেষ হবার আগেই ছোট ভাই বললে, হ্যাঁ, তাও দেখেছি। এত তপস্যা করে হাতীটাকে একবার মারলে আবার বাঁচালে। আচ্ছা দাদা, এতে তোমার কি হল ?

ভাইএর কথায় সাধুটি সেখানে একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কি ভেবে আবার বনের দিকে চলে গেল। ভাইএর দিকে অথবা মুগ্ধ জনতার দিকে আর ফিরে তাকালে না।

স্বপনের রাজা

একজন চাষা ছিল বড় ভাল। কারুর সঙ্গে সে ঝগড়া বিবাদ করত না, কাউকে ঠকাবার চেষ্টাও করত না। আপন মনে সে নিজের চাষবাস নিয়েই থাকত।

চাষার একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর ছিল, কাজ কর্মে কথায় বার্তায় তেমনি ছিল চমৎকার। যে দেখত, যে তার সংগে দু-দণ্ড কথা বলত, সেই তার প্রশংসা না করে পারত না। সন্তান যদি মাত্র একটি হয়, তাহলে মা বাপের কাছ থেকে সে খুব আদর পায়। তার ওপর ছেলেটি যদি গুণী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। চাষা আর চাষাবউ দুজনেই তাদের ছেলেকে বড্ড ভালবাসত।

একদিন দুপুর বেলা ছেলেটি খেতে বসেছে। জল খাবে বলে মুখে যেই গেলাসটি তুলেছে, অমনি সন্ন্যাস রোগে ছেলেটি মারা গেল। সন্ন্যাস রোগ সত্যিই বড় সাংঘাতিক। এক মিনিট আগেও মানুষ রোগের কথা বুঝতে পারে না। আবার রোগ হবার সংগে সংগেই অধিকাংশ লোক মারা যায়। একটি কথা বলবারও সময় পায় না।

চাষা তখন মাঠে। এ সব কিছুই জানে না, এক মনে সে ক্ষেতের কাজ করছে। এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাকে ছেলের খবর দিলে। একটু সময় চাষা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কাস্তে কোদাল নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এল।

তাকে দেখে চাষাবউ আরো চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। চাষা একবার গিয়ে ছেলেকে দেখলে। তারপর দাওয়ার এক কোণে এসে চুপটি করে বসে রইল। তার চোখে এক ফোঁটা জলও নেই।

জ্ঞাতিরা এসে ছেলেটিকে শ্মশানে নিয়ে গেল। চাষা গেল না। একই ভাবে চুপটি করে সে সেখানে বসে রইল। ছেলের মা কাঁদতে কাঁদতে তখন বলছে, কি পাষাণ মানুষ। আমার এমন গুণধর ছেলেটি মারা গেল। কিন্তু ওর চোখে এক ফোঁটা জলও নেই।

চাষা তখন তার পরিবারকে ধীরে ধীরে বললে, শোন, কাল রাত্রে আমি একটা স্বপন দেখলুম। দেখলুম আমি রাজা। মস্ত বড় আমার রাজ্য, রাজবাড়ি, গাড়ি ঘোড়া, সেপাই সামন্ত সব। তারপর আমার একে একে সাতটি ছেলে হল। ছেলেরা সব লেখায় পড়ায় বিদ্যায় মহা গুণধর হয়ে উঠল। আর রূপের কথা কি বলব? যেন এক একটি চাঁদ রাজবাড়ি আলো করে রয়েছে। আমার সুখের শেষ নেই। তারপর কি হল জান? হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখনও আমার মনে সেই রাজবাড়ি, সেই আমার সাত সাতটি ছেলের মুখ জ্বল জ্বল করছে। এখন ভাবছি তোমার এই এক ছেলের জন্যে শোক করব, না আমার সেই সাতটি ছেলের জন্যে, রাজ্য রাজত্ব রাজবাড়ির জন্যে শোক করব।

কে তোমার

গুরু তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, সংসারে তোমার কে আছে ?

শিষ্য জবাব দিলে, আজ্ঞে, আমার স্ত্রী আছেন, আমার ছেলে মেয়ে আছে।

গুরু বললেন, না তাদের কেউ তোমার আপন নয়। একমাত্র ঈশ্বর তোমার আপনার।

শিষ্য চুপ করে রইল।

শিষ্যের মনের কথা গুরু বুঝতে পারলেন, বললেন, আমার কথা তুমি ঠিক অন্তর দিয়ে নিতে পারছ না, না ?

শিষ্য বললে, আজ্ঞে, আমার স্ত্রী আমাকে বড্ড ভক্তি করেন।

গুরু বললেন, হ্যাঁ, ঐ ভক্তির কোন দাম নেই। সত্যিকার ভালবাসা তোমার ওপর কারুরই নেই। তুমি কার, কে তোমার, এইটি মনে মনে চিন্তা কর।

চিন্তিত মনে শিষ্য গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিলে। কিছুদিন পর গুরু আবার জিজ্ঞেস করলেন শিষ্যকে, বাবা, এখন বল দেখি, কে তোমার ?

মাথা চুলকতে চুলকতে শিষ্য জবাব দিলে, আজ্ঞে, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে মেয়ে, এরাই আমার।

—না, এরা তোমার কেউ নয়। গুরু বললেন।

মাথা নিচু করে বসে রইল শিষ্য। সে বুঝতে পারলে গুরুদেব

যা বলছেন, ঠিকই বলছেন এবং তার ভালর জন্যেই বলছেন। কিন্তু তার অন্তর তাতে সায় দিতে পারছে না।

শিষ্যের মনের ভাব বুঝতে পেরে গুরু বললেন, আমি বুঝতে পারছি, আমার উপদেশ তুমি এখনও ঠিক ঠিক ভাবে নিতে পারছ না। আচ্ছা, আজ বাড়ি যাও, এইটি মনে মনে ভাবনা করো। কিছুদিন পরে আবার আমার কাছে এস।

শিষ্য চলে গেল।

কিছুকাল পরে আবার গুরু জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার ?

শিষ্য আগের মতই জবাব দিলে।

একটা ওষুধের বড়ি শিষ্যের হাতে দিয়ে গুরু বললেন, না, তারা তোমার কেউ নয়। একমাত্র ঈশ্বরই তোমার আপনার। এই ওষুধটি নাও। রাত্রে ঘুমবার সময় খেয়ে শুয়ে থেকো।

শিষ্য বাড়ি গিয়ে কারুর কাছেই কিছুই বললে না, ঘুমবার সময় গুরুর দেওয়া ওষুধটি খেয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

পরদিন সকাল বেলা কান্না শুনে গ্রামের লোক সব ছুটে এল।

—কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

—কাঁদতে কাঁদতে শিষ্যের স্ত্রী বললে, ওগো, ওর হঠাৎ কি হয়ে গেছে, তোমরা গিয়ে দেখ। ওগো, আমার কি হবে গো ? আমি কি করব গো ?

মেয়েটি চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। গ্রামের লোকেরা গিয়ে দেখে শিষ্যটি মরে গেছে। আর তার শরীরটা কি রকম আকা-বাঁকা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে আছে।

মেয়েটি কাঁদছিল, ওগো, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে গো।

আর আমি বাঁচতে চাই নে। ওর সংগে আমাকেও তোমরা শ্মশানে নিয়ে যাও গো। বেঁচে থেকে আমার কি হবে গো। আমিও ওর সংগে মরব গো।

মেয়েটির বুকফাটা কান্নায় সবার চোখেই জল এল।

আত্মীয় স্বজনরা খাট আনলে এবং শ্মশানে নিয়ে যাবার আয়োজন করতে লাগল। মেয়েটি উঠানে আছাড় খাচ্ছে আর কাঁদছে, ওগো, আমার কি হল গো। তুমি আমাদের কি করে গেলে গো। ওগো দিদি গো, এমন হবে কখনও তা জানতুম না গো।

উঠানে পড়ে বার বার আছাড় খাচ্ছে দেখে গ্রামের তু তিন জন মেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরলেন। কিন্তু মনের তুঃখে সে এমন ভাবে ছটফট করছে যে তু তিন জন মিলে অতি কষ্টে তাকে ধরে আটকালেন।

এ দিকে আত্মীয়েরা ঘর থেকে শব বের করবার আয়োজন করলেন। দরজার কাছে এসেই হল মুশকিল। শিষ্যের শরীর এমন ভাবে আঁকা-বাঁকা হয়ে আছে যে কিছুতেই কোন ভাবেই দরজা দিয়ে বেরুল না। তখন তারা হাত পা গুলো জোর করে সোজা করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সাধ্য কি? হাত পা ও শরীরের প্রত্যেকটি জায়গা শক্ত হয়ে একেবারে লোহা হয়ে গেছে।

উপায় কি? শবটিকে তো বের করতেই হবে।

শেষ কালে একজন একখানি কুড়ুল এনে দরজার চৌকাট কাটতে শুরু করলে। কাঠ কাটার তুম দাম শব্দে শিষ্যের স্ত্রীর বুকফাটা কান্না হঠাৎ থেমে গেল। যে সব মেয়েরা তাকে ধরে

রেখেছিল, নিমিষে তাদের হাত ছাড়িয়ে দরজার কাছে সে ছুটে গেল। কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করলে, ওগো, তোমরা দরজা কাটছ কেন ?

একজন জবাব দিলে, নইলে ওঁকে ঘর থেকে বের করা যাচ্ছে না।

স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো, অমন কর্ম করো না গো। আমি তো এখন অনাথা হলুম। আমাকে দেখবার লোক আর কেউ নেই। ছুটো কচি কচি ছেলে মেয়েকে আমার মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে আর হবে না।

কাঁদতে কাঁদতে সে বললে, ওগো, কি বলব গো। ওর যা হবার তা হয়েই গেছে। ওর শরীরটা তো এখনই আগুনে যাবে। বরং এক কাজ কর। ওর হাত পা একটু একটু কেটে বের করে নাও গো। ওগো দিদি গো, আমার কি হবে গো।

বলেই আবার চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে।

এদিকে হল কি ? ওষুধের এমনই গুণ, মড়ার মত হয়ে গেলেও শিষ্যের ভেতরে ভেতরে জ্ঞান ছিল। সবই সে শুনতে পাচ্ছিল। তখন তার শরীর রাগে গরম হয়ে উঠল। আর তাতেই ওষুধের গুণও কেটে গেল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শিষ্য তখন বললে, তবে রে রাক্ষুসী আমার হাত পা কাটবে ? এদিকে আমার জন্যে কত কান্না !

ফাতনা ডুবছে

পুকুরে ছিপ ফেলে একজন মাছ ধরছিল।

ছিপ ফেলে মাছ ধরবার নেশা বড় সাংঘাতিক। এ নেশায় যাকে পায়, সে সব ভুলে যায়। মাছ ধরতে গেলে ছুনিয়ার আর কিছু মনে থাকে না।

যে মাছ ধরছিল, অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর সে দেখলে তার ফাতনাটা নড়ছে। মাঝে মাঝে কাত হচ্ছে। লোকটি তখন ছিপ হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সে সময় একজন পথিক এসে জিজ্ঞেস করলে, মশাই, বোসেদের বাড়ি কোন্ পথে যাব বলুন তো?

কোন জবাব নেই।

পথিক আবার জিজ্ঞেস করলে, ও মশাই, শুনছেন? বোসেদের বাড়ি কোন্ পথে যাব?

কে কার কথা শোনে!

ছিপ হাতে করে লোকটি ফাতনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে পথিক ভাবছে, লোকটা কালা নাকি? আরো চীৎকার কে সে বললে, ও মশাই, শুনছেন, ও মশাই, শুনছেন?

মশাইএর কানে তখন কিছু যাচ্ছে না। তিনি তখন ছিপ হাতেই ব্যস্ত। ভাবছেন কখন টান মারবেন।

পথিক আবার ডাকলে। তবুও কোন জবাব পেলে না। শেষ কালে হয়রান হয়ে পথিক চলে গেল।

ফাতনাটি ডুবছে, লোকটির হাতও তখন কাঁপছে। তারপর টান মেরে মাছটাকে গেঁথে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ মুছে পথিকের দিকে চেয়ে দেখলে অনেক দূর চলে গেছে। লোকটি চীৎকার করে ডাকতে লাগল, ও মশায়, শুনুন শুনুন। শুনে যান।

পথিক কিছুতেই ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। পথিক ভারী বিরক্ত হয়ে গিছল, বললে, কি মশায়, ডাকছেন কেন আবার ?

লোকটি বললে, আপনি আমাকে তখন কি বলছিলেন ?

পথিক ভয়ানক চটে গেল, বললে, বেশ, তখন অতবার করে জিগগেস করলুম, কথাটি বললেন না, আর এখন বলছেন—কি বলছিলেন।

লোকটি বললে, আহা, কেন রাগ করছেন ? আমার যে তখন ফাতনা ডুবছিল।

যকের ধন

সে অনেক দিনের কথা। এক নাপিত পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বনের ধারের পথ। হঠাৎ নাপিত শুনতে পেলে কে যেন তাকে বলছে, সাত ঘড়া মোহর নিবি ?

নাপিত চমকে উঠল। চারদিক চেয়ে সে দেখলে কোথাও কেউ নেই। ভাবলে মনের ভুল। আবার সে চলতে লাগল। খানিক পরে আবার সে শুনতে পেলে, সাত ঘড়া মোহর নিবি ?

না, এবার আর মনের ভুল নয়, একেবারে পরিষ্কার আওয়াজ। তার মনে লোভ হল। বললে, নেব।

—যা, তোর বাড়িতে দিয়ে এলুম।

কতক টাকার লোভে আর কতক কৌতূহলে তাড়াতাড়ি নাপিত বাড়ি ফিরে গেল। ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে অবাক কাণ্ড। সত্যিই কে সাতটি ঘড়া সেখানে রেখে গেছে। নাপিত দেখলে ছ-টি ঘড়া মোহরে ভর্তি আর একটি খালি। তাড়াতাড়ি সে ঘড়া-লুকিয়ে ফেললে।

নাপিতের মনে তখন কি আনন্দ। সে ভাবলে তার মত সুখী সে বলে আর কেউ নেই।

তারপর নাপিতের মনে মহা ভাবনা হল, কি করে ঐ খালি ঘড়াটাও ভর্তি করা যায়। নাপিতের অবস্থা ভালই ছিল। তার ঘরে সোনা রূপা অলংকার টাকা পয়সা যা ছিল, সবই এনে সে ঘড়ার মধ্যে পুরলে। ঘড়া তবুও ভর্তি হল না।

সংসারের খরচ কমিয়ে রোজই কিছু কিছু ঐ ঘড়াতে রাখতে লাগল। এ ভাবে অনেক কাল পরেও দেখলে ঘড়া ভর্তি হল না। তখন এক বুদ্ধি করলে। সে ছিল রাজার নাপিত। রাজার কাছে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করে বললে, আমি যা মাইনে পাই, তাতে আমার সংসার চলে না। বড় কষ্ট যাচ্ছে।

শুনে রাজার মনে দয়া হল। তিনি তার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলেন। আয় তার যত বাড়ছিল, টাকা জমাবার নেশাও ততই তাকে পেয়ে বসছিল। মাইনের সমস্ত টাকা এনে সে ঘড়ার মধ্যে জমা করতে লাগল। ঘড়া কিন্তু কিছুতেই ভর্তি হয় না।

নাপিতের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হতে লাগল। শেষকালে বাধ্য হয়েই সে ভিক্ষে করতে শুরু করলে। কাপড় ছেঁড়া ও ময়লা, চেহারাও ভয়ানক খারাপ হয়ে চলল দিনের পর দিন।

তার অবস্থা দেখে রাজার মনে কি রকম সন্দেহ হল। তিনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তোর কি হয়েছে বল দেখি।

—আজ্ঞে, আমি খেতে পাই নে।

রাজা বললেন, কেন তুই খেতে পাস নে? আগেও তো তোর এমন অবস্থা হয় নি কোন দিন। এখন তোর মাইনে দ্বিগুণ করে দিয়েছি। কি হয়েছে তোর বল তো।

নাপিত চুপ করে রইল, কোন জবাব দিলে না।

রাজার সন্দেহ তখন আরও বেড়ে গেল। বললেন, হ্যাঁ রে, তুই কি সাত ঘড়া এনেছিস নাকি?

নাপিত তো একেবারে অবাক্। বললে, আপনি কি করে জানলেন?

রাজা বললেন, তা হলে তুই এনেছিস বল। সর্বনাশ করেছিস তুই। ও যে যকের ধন রে। যকটা আমার কাছে এসে একদিন বললে, সাতঘড়া মোহর নিবি? আমি বললুম, জমার টাকা না খরচের টাকা? কথা শুনেই যকটা গেল পালিয়ে। আর আমার কাছে আসে নি।

চিন্তিত হয়ে নাপিত জিজ্ঞেস করলে, আজ্ঞে, আমি তা হলে কি করব?

—কি করবি? রাজা বললেন, ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে, এক্ষুণি ফিরিয়ে দে যকের ধন। ও টাকা কি নিতে আছে? ও হচ্ছে জমার টাকা। শুধু জমাই করতে হবে। খরচ করবার যো নেই। ভাল চাস তো যকের ধন ফিরিয়ে দে।

রাজার কথা শুনে তখনি নাপিত বাড়ি ফিরে এল। ঘড়ার সামনে গিয়ে সে বললে, তোমার সাত ঘড়া তুমি ফিরিয়ে নাও, ও আমি চাই নে।

কথা শেষ হবার সংগে সংগেই সাত ঘড়া হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যে ধন অনেক কষ্টে এতদিন ধরে নাপিত জমিয়েছিল, তাও চলে গেল।

ভিকিরি

বনে কুটির বেঁধে এক ফকির বাস করতেন। ধর্মের পথে তিনি খুব উন্নতি করেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। তাঁকে দেখবার জন্যে এবং তাঁর উপদেশ শোনবার জন্যে তখন দলে দলে লোক আসতে লাগল।

ফকিরের যে সামান্য জায়গা ছিল, তাতে অতিথিদের কুলত না। অতিথি অনেক আসলে তাঁদের খাওয়াবার শক্তিও ফকিরের ছিল না। অথচ লোক আসা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

অতিথিদের কষ্ট দেখে ফকিরের মনে বড় দুঃখ হল। অনেক ভেবে শেষকালে তিনি একদিন বাদশার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দান করতেন বলে বাদশার ছিল খুব নাম।

রাজবাড়ি গিয়েই ফকির শুনলেন, বাদশা নমাজ পড়ছেন। সাধু ফকিরকে কেউ বাধা দিলে না। ফকির একেবারে নমাজ ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। বাদশা নমাজ পড়ছেন, পেছনে চুপটি করে বসে রইলেন ফকির। ফকির দেখলেন নমাজের শেষে বাদশা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু, তুমি আমাকে আরও ধন দাও, দৌলত দাও, আরও রাজ্য দাও রাজত্ব দাও, সুখ দাও সম্মান দাও।

এই সময় ফকির উঠে নমাজের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে বাদশা তাঁকে ইসারা করে বসতে বললেন। ফকির বসলেন। নমাজ শেষ করে বাদশা ফকিরকে জিজ্ঞেস করলেন,

ফকির, আপনি এসে বসলেন, আবার কোন কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলেন যে ?

ফকির বললেন, আপনার কাছে একটা জরুরী দরকারে এসেছিলুম।

—তাহলে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলেন কেন ?

—চলে যাচ্ছিলুম, দেখলুম আপনার কাছে বলবার আর দরকার নেই।

—তবুও বলুন না, কি কাজে এসেছিলেন ?

—সে আপনার শুনে কাজ নেই।

তবুও বাদশা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। না বললে কিছুতেই তিনি ফকিরকে ছাড়েন না। শেষকালে ফকিরকে বাধ্য হয়ে বলতেই হল। তাঁর আশ্রমের কথা সব বলে তিনি বললেন, আমার অনেক টাকার দরকার বাদশা, আপনার কাছে তাই টাকা চাইতে এসেছিলুম।

বাদশা বললেন, তা হলে আমাকে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলেন কেন ?

ফকির জবাব দিলেন, আমি ভিকিরি, দেখলুম আপনিও ভিকিরি। নমাজের পর আপনিও ঈশ্বরের কাছে ধন-দৌলত ভিক্ষে চাইলেন। ভিকিরির কাছে ভিক্ষে চেয়ে আর কি হবে। চাইতে হয় একেবারে ঈশ্বরের কাছেই চাইব।

কে বড়

নারদের নাম আমরা সবাই জানি। বীণা বাজান আর রাতদিন ভগবানের নাম গান করে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান। নারদ ভগবানের একজন খুব বড় ভক্ত। নারদ নিজেও মনে করতেন যে তাঁর মত ভগবানের ভক্ত আর কেউ নেই। ভক্তদের মাঝে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

একদিন ভগবান বললেন, নারদ, আমার একটু বেড়াতে ইচ্ছে হয়েছে। আমি ছদ্মবেশে যাব। তুমিও চল আমার সংগে।

ভগবানের কথায় নারদ ভারী খুশী হলেন, বললেন, নিশ্চয়ই যাব আমি আপনার সংগে বেড়াতে।

দুজনেই ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন।

নানা জায়গায় ঘুরে শেষকালে তাঁরা একটা মাঠের শেষে এক বুড়ো বামুনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখলেন বুড়ো শুকনো ঘাস পাতা এই সব খাচ্ছে। নারদ বললেন, ঠাকুর, শুকনো ঘাস পাতা খাচ্ছে, লোকটা পাগল নাকি ?

ভগবান বললেন, এই বুড়োটি খুব ভক্ত। কাউকে তিনি হিংসে করেন না। এজন্যেই জ্যান্ত কিছু তিনি খেতে পারেন না, শুকনো ঘাস পাতা খাচ্ছেন।

বামুনের কোমরে একখানি তরবারি ঝুলছিল। আশ্চর্য হয়ে নারদ বললেন, ঠাকুর, অত বড় ভক্ত লোক, কাউকে তিনি হিংসে করেন না। কিন্তু কোমরে ঐ তরবারিটি রয়েছে কেন ?

ভগবান জবাব দিলেন, তরবারির কথা তুমিই তাকে জিজ্ঞেস কর নারদ।

নারদ ও ভগবান এগিয়ে গেলেন বামুনের কাছে। নারদ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি মস্ত বড় ভক্ত লোক। কিন্তু আপনার কোমরে ঐ তরবারিখানা রেখেছেন কেন?

বামুন বললেন, বাবা, সে অনেক কথা।

বলতে বলতেই বামুনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। উত্তেজিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, জান? এই তরবারি রেখেছি আমি তিনটা মানুষের মুণ্ডু কাটব বলে।

নারদ অবাক্।

বামুন বলতে লাগলেন, প্রথমটি হল অর্জুন। লোকটা ভারী খারাপ। আর লোক পেলে না, আমার ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে করলে তার রথের সারথি। কি আস্পর্ধা বল তো। শুধু তাই নয়, বার বার প্রশ্ন করছে আর ঠাকুরকে বকাচ্ছে। তার গলাটা আমি দুটুকরো করব। তারপর ঐ দ্রৌপদী। মেয়েটা অমনি মন্দ ছিল না। কিন্তু তারও খুব আস্পর্ধা। সেও আমার ঠাকুরকে পাতের এঁটো খাওয়ালে। তাকেও আমি ছাড়ব না। আর একটি হল তোমাদের ঐ নারদ গো। সেও কম যায় না। কাজ নেই কর্ম নেই, রাতদিন শুধু ঠাকুরকে ডাকছে। তার জ্বালায় ঠাকুর আমার একটুখানি বিশ্রামও করতে পান না। এ তরবারিখানা এই তিন জনের জন্যেই রেখেছি।

নারদ তখন বামুনকে প্রণাম করলেন, আর খুব ভক্তি করে বামুনের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। তাই দেখে ভগবান মুখ টিপে একটু হাসলেন।

বড় ভক্ত

নারদ এসে ভগবানকে বললেন, প্রভু, সব চাইতে আপনার বড় ভক্ত কে? তাঁকে আমার দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়।

ভগবান বললেন, বেশ তো। পৃথিবীতে যাও, মহেশপুর গ্রামের মলুরামই আমার বড় ভক্ত। তার মত ভক্তি বর্তমানে আর কারুরই নেই।

বীণাটি হাতে করে নারদ তখনই পৃথিবীর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি রাত দিন ভগবানের নাম করেন। এক মুহূর্তও বিরাম যায় না। তাই হয়তো নারদের মনে একটু অহংকারও হয়েছিল।

নারদ দেবতাদের ঋষি। তাই নারদও একজন দেবতা। দেবতারা আকাশ পথে চলাফেরা করেন। তাঁরা সকলকেই দেখতে পান, কিন্তু তাঁদের কেউ দেখতে পায় না। নারদের নাকি আবার একটা বিমান ছিল। সেটি দেখতে অনেকটা ঢেঁকির মত। তাই লোকে বলে নারদের বাহন ঢেঁকি।

দেখতে না দেখতে নারদের ঢেঁকি এসে হাজির হল মহেশপুরের একেবারে মাথার ওপর। তারপর মলুরামের বাড়িটা খুঁজে বের করতে নারদের বেশী দেরি হল না।

সবার অলক্ষ্যে আকাশ থেকে নারদ খুব মন দিয়ে মলুরামের প্রত্যেকটি কাজ লক্ষ্য করতে লাগলেন। প্রথমেই নারদের ভয়ানক হাসি পেল এই দেখে যে ভগবান যাকে সব চাইতে বড় ভক্ত বললেন, সে একটি চাষা।

নারদ দেখতে লাগলেন, ভোর হতে না হতেই মলুরাম ঘুম থেকে উঠল। উঠেই মাত্র একটিবার ভগবানের নাম করলে, তারপর লাঙল গরু নিয়ে চলে গেল মাঠে।

ঢেঁকি চড়ে নারদও চললেন মাঠে। ক্ষেতের কাজ শেষ করে মলুরাম বাড়ি ফিরে এল। নারদও ফিরে এলেন। তিনি দেখছেন আর মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছেন যে মলুরাম আর একবারও ভগবানের নাম করছে না। মনে মনে ভাবছেন, বাঃ, কি চমৎকার ভক্তই দেখছি। আচ্ছা শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক।

অনেক রাত পর্যন্ত চাষা তার সংসারের কাজ কর্ম করে তুটি খেলে। তারপর বিছানায় পড়ে আর একবার ভগবানের নাম করলে। তারপর ঘুম।

নারদ মনে মনে ভাবছেন, ভগবান নিশ্চয়ই আমাকে পরীক্ষা করছেন, অথবা আমাকে নিয়ে একটু রহস্য করছেন। এই চাষাটা কখনও বড় ভক্ত হতে পারে? সারাটি দিনের মাঝে সংসারের কাজ নিয়েই তো ব্যস্ত। নাম করলে মাত্র দু বার।

ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে নারদ বললেন, প্রভু আপনার রহস্য আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। কাকে আপনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত বললেন?

ভগবান সবই বুঝতে পারলেন, বললেন, নারদ, একটা কাজ কর। এই বাটিটা নাও। হাতে করে আমার বাড়ির চারদিকে ঘুরে এস। সাবধান, এক ফোঁটা তেলও যেন না পড়ে।

ভগবান নারদের হাতে কানায় কানায় ভর্তি এক বাটি তেল দিলেন। তাই নিয়ে নারদ চললেন বাড়িটি ঘুরে আসতে।

অতি সাবধানে নারদ চলেছেন। কারণ সামান্য একটু অসাবধান হলেই বাটি থেকে তেল পড়ে যাবে। নারদের হাতের বীণাটি কিন্তু আগেই রেখে যেতে হয়েছে।

নারদ ফিরলেন।

ভগবান বললেন, সাবাস। এক ফোঁটা তেলও পড়ে নি তো ?

—না। নারদ তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন।

ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নারদ, তুমি তো আমার একজন বড় ভক্ত। রাতদিনই অবিরাম আমার নাম করছ। আচ্ছা, তেলের বাটিটা হাতে নিয়ে তুমি যখন আমার বাড়িটা ঘুরে আসতে চললে, সেই সময় থেকে বাটিটি ফেরত দেবার আগ পর্যন্ত তুমি কতবার আমার নাম করেছ ?

—একবারও করতে পারি নি প্রভু।

—সে কি কথা ? যেন আশ্চর্য হয়েই ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।

নারদ জবাব দিলেন, তেলের বাটি হাতে নিয়ে চলবার সময় অন্য দিকে একটুখানি মন দেবার কি উপায় ছিল ? তা হলে যে তেল পড়ে যাবে।

ভগবান বললেন, দেখ নারদ, আমার নাম না নিয়ে এক দণ্ডও তুমি থাক না। অথচ সামান্য একবাটি তেল যত সময় তোমার হাতে ছিল, একবারও তুমি নাম নিতে পারলে না। এবার আমার মলুরামের দিকে চেয়ে দেখ। মস্ত বড় একটা সংসারের বোঝা তার ঘাড়ের ওপর। তবুও প্রত্যেক দিন দুবার করে আমার নাম নিচ্ছে। কত বড় ভক্ত সে বল দেখি !

মলুরামকে উদ্দেশ করে নারদ যোড়হাত কপালে ঠেকালেন।

জল একটু জল

একদিন নারদ নারায়ণকে জিজ্ঞেস করলেন, ভগবান, আপনার মায়াটা কি?

নারায়ণ জবাব দিলেন, আমার মায়াটা যে কি, সে কথা বলা বড় কঠিন।

একটু থেমে বললেন, আচ্ছা, তুমি কি মায়া দেখতে চাও নারদ?

খুশী হয়ে নারদ বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার মায়া দেখব। অনেক দিন থেকেই আমার মনে এই সাধ।

নারায়ণ বললেন, আচ্ছা দেখাব।

তারপর একদিন হঠাৎ নারায়ণ এসে নারদকে বললেন, নারদ, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

দুজনেই তাঁরা বেরিয়ে গেলেন।

দুজনই বেড়াচ্ছেন, এটা ওটা দেখছেন এবং নানা রকম গল্প করছেন। এ ভাবে তাঁরা অনেক দূর চলে গেলেন। নারায়ণ বললেন, নারদ, আমার বড় পিপাসা হয়েছে। শিগগির তুমি আমার জন্যে জল নিয়ে এস।

নারদ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন, প্রভু, আপনি এই গাছতলায় বসুন। আমি এক্ষুণি জল নিয়ে আসছি।

নারায়ণ বললেন, হ্যাঁ, যত শিগগিব পার নিয়ে এস। তেষ্টায় আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ঐ যে সামনেই নদী। যাও।

নারদ ছুটে চললেন।

নদীর ঘাটে পৌঁছেই তিনি দেখলেন, একটি মেয়ে সেখানে বসে আছে। এত সুন্দর মেয়ে নারদ আর কখনও দেখেন নি। মেয়েটিকে তাঁর ভারী পছন্দ হল। তিনি তাকে বিয়ে করলেন।

বিয়ে তো হল, কিন্তু থাকবেন কোথায়? নিজের হাতেই নারদ নদীর ধারে একখানি কুঁড়ে তৈরী করলেন। নারদের মনে কোন দুঃখ নেই। মনের সুখে পরিবার নিয়ে তিনি সেখানে বাস করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে তাঁদের কয়টি ছেলে মেয়েও হল। তাদের মুখ দেখে মা বাপের মনে কি আনন্দ! কিন্তু নারদের সুখের দিন শেষ হয়ে এল। হঠাৎ লাগল সে দেশে ভয়ানক মড়ক। লোক যত মরতে লাগল, ভয় পেয়ে তত পালাতেও লাগল।

নারদের পরিবার বললেন, ওগো, আমার জন্যে ভাবছি নে। এই কাচ্চা বাচ্চাগুলোর জন্যেই তো ভাবনা। দেখছ না দলে দলে লোক পালিয়ে যাচ্ছে। চল আমরাও কোথাও যাই।

নারদ বললেন, তাই চল।

ছেলে মেয়েদের হাত ধরে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। নদীর পোলের ওপর যেই তাঁরা উঠেছেন, নারদের হাত থেকে ফসকে গিয়ে বড় ছেলেটি জলে তলিয়ে গেল। নারদ ও তাঁর পরিবার চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তখন আর একটি মেয়ে পড়ে গেল জলে এবং দেখতে না দেখতে স্রোতের টানে গভীর জলে তলিয়ে কোথায় চলে গেল।

তারপর আর একটি, তারপর আর একটি, তারপর কাঁধেরটি, এবং সকলের শেষে কোলেরটি পর্যন্ত যেন কোন যাদুমন্ত্রে ঝপঝপ

করে জলে পড়ে গেল। নারদ কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। কেঁদে কেঁদে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ পা পিছলে মেয়েটিও নদীতে পড়ে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলেন।

পোলের উপর বসে বসেই নারদ কাঁদতে লাগলেন। কান্নায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা করুণ স্বর তাঁর কানে এল—নারদ, জল একটু জল।

নারায়ণের কণ্ঠস্বর নারদ চিনতে পারলেন। তাঁর স্বপন যেন হঠাৎ ভেঙে গেল। তাঁর মনে হল নারায়ণের জন্যে জল আনতেই তো তিনি নদীতে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে গাছতলায় তিনি নারায়ণের কাছে হাজির হলেন।

নারায়ণ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি নারদ, কি খবর?

প্রণাম করে নারদ বললেন, প্রভু, আপনার মায়ার খেলার খানিকটা দেখতে পেলুম। নারদের চোখে কান্নার চিহ্ন, মুখে হাসি।

যিনি মেরেছেন তিনিই খাওয়াচ্ছেন

এক সন্ন্যাসী ভিক্ষে করতে গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামের জমিদার ছিলেন বড় অত্যাচারী। যখন তখন গরীব লোককে ধরে মার ধোর করতেন। সন্ন্যাসী দেখলেন জমিদার পথের ওপরই একটি গরীব লোককে ধরে মারছেন।

চোখের সামনে এই কাণ্ড দেখে সন্ন্যাসী আর সহ্য করতে পারলেন না। তখনই তিনি জমিদার ও গরীব লোকটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন আর জমিদারকে বাধা দিতে লাগলেন। জমিদার গিয়েছিলেন ভয়ানক রেগে। গ্রামের জমিদার তিনি। তাঁর কাজে বাধা দেবার সাহস কেউ কখনও করে নি। কোথাকার এই ভিকিরি সন্ন্যাসী এসে বাধা দিলে। জমিদার গরীব লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত রাগ ঝাড়লেন সন্ন্যাসীর ওপরেই। সন্ন্যাসী বাধা দিলেন না, একটি কথাও বললেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগলেন। কিন্তু জমিদার এমন মার মারলেন যে সন্ন্যাসী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

সন্ন্যাসীকে সেই অবস্থায়ই ফেলে রেখে জমিদার চলে গেলেন। তখন গ্রামের লোকেরা ধরাধরি করে তাঁকে আশ্রমে পৌঁছে দিলে। আশ্রমের অন্যান্য সাধুরা তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

এদিকে বাড়ি গিয়ে খানিক পরেই জমিদারের রাগ পড়ল। নিরপরাধ সাধুকে এভাবে মারা যে তাঁর কত বড় অন্যায় হয়েছে, তিনি তা বুঝতে পারলেন। তাঁর মনে তখন ভারী দুঃখ হল।

কিছু ঔষধ আর পথ্য নিয়ে তখনই তিনি আশ্রমে চলে গেলেন। সন্ন্যাসীর তখনও জ্ঞান হয় নি। সাধুরা তাঁর সেবা করছেন।

জমিদার সাধুদের কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন ও ক্ষমা চাইলেন। সাধুরা তাঁকে রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন। রোগীর তখনও জ্ঞান নেই। কাছে বসে জমিদার তাঁকে একটু একটু দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। দুধ খেতে খেতে সন্ন্যাসী চোখ চাইলেন।

জ্ঞান হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে অন্যান্য সাধুরা তখন জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছেন?

সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে বললেন, যিনি মেরেছেন তিনিই খাওয়াচ্ছেন।

বিভীষণের দেশে

সে সব দিনে সওদাগররা বড় বড় নৌকোতে মালপত্র নিয়ে অনেক দূর দূর দেশে যেত বাণিজ্য করতে। একবার এক সওদাগর এমনি সওদাগরি করতে বেরুল সমুদ্র পথে। মাঝ সমুদ্রে এল ভীষণ ঝড়। মাঝি মাল্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারলে না। নৌকো ডুবে গেল।

সওদাগর আর অন্যান্য যারা নৌকোতে ছিল, সবাই তখন জলে। ঝড়ের বেগে আর ঢেউএর দাপটে কে কোন্ দিকে ভেসে গেল, তার ঠিক নেই।

ভেসে ভেসে সওদাগর আধমরা হয়ে এক দ্বীপে গিয়ে লাগল। সেই দ্বীপটি হল আবার রাক্ষসের দেশ লংকাপুরী, রাবণ রাজার রাজ্য। সমুদ্রের পারে যে সব রাক্ষস ছিল, একটা মানুষ আসছে দেখে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। রাক্ষসেরা মানুষ খাবার যম। মানুষ আসছে দেখে তাদের জিব দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কিন্তু মানুষ খাবার তাদের উপায় ছিল না।

রামের হাতে রাবণ রাজা মরেছেন। তাঁর ভাই বিভীষণ তখন লংকার রাজা। রাবণ রাজার সময় মানুষ খাবার ভারী সুবিধে ছিল। কিন্তু বিভীষণ আইন করে সে সব একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন।

সওদাগরকে ধরে রাক্ষসেরা হাজির করলে একেবারে বিভীষণের রাজসভায়। সওদাগরকে দেখেই বিভীষণ সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে

পড়লেন, মাটিতে পড়ে প্রণাম করলেন, তারপর তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজের হাতে চামর দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

বিভীষণের কাণ্ড দেখে সওদাগর তো একেবারে হতভম্ব। রাজা কি পাগল হলেন, না সে স্বপ্নই দেখছে, সওদাগর মনে মনে ভাবতে লাগল।

হয়েছে কি? বিভীষণ ছিলেন রামের ভক্ত। রাম ছিলেন মানুষ, সওদাগরও মানুষ। রামের স্বজাতি একজনকে পেয়ে বিভীষণের মনে আনন্দ ধরে না। তিনি সওদাগরকে অনেক যত্ন করে খাওয়ালেন, দামী দামী পোশাক পরিচ্ছদ উপহার দিলেন, তার ওপর নিজের হাতে রাত দিন সেবা করতে লাগলেন।

কিছু দিন পর সওদাগর বিভীষণকে বললে, আপনার আদর যত্ন সত্যিই অদ্ভুত। এবার আমার দেশে যাবার একটু ব্যবস্থা যদি করে দেন, ভারী খুশী হব। বাড়ীর জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে।

বিভীষণ বললেন, বেশ আজ থাকুন। কাল সকালেই আমি আপনার সমুদ্র পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পরদিন সকালে বিভীষণ এসে সওদাগরের কাপড়ের খুঁটে ছোট্ট একটা কি বেঁধে দিয়ে বললেন, আপনি এবার যেতে পারেন

সওদাগর বললে, রাজা, এই সমুদ্রটা—

কথা শেষ হবার আগেই বিভীষণ জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এই যে জিনিসটি আমি আপনার কাপড়ে বেঁধে দিলুম, এর গুণেই আপনি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি এবার আসুন।

বিভীষণ আবার ভক্তিভাবে প্রণাম করে সওদাগরকে বিদায় দিলেন। সমুদ্রের ধারে এসে সওদাগর কি একটুখানি ভাবলে, তারপর যেই জলে পা বাড়িয়েছে দেখে সত্যি সত্যি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

সওদাগর জলের ওপর দিয়ে বেশ চলতে লাগল। কিন্তু বার বারই তার মনে হতে লাগল, এমন কি জিনিস বিভীষণ বেঁধে দিলে যার গুণে জলের উপর দিয়ে ডাঙার চেয়েও সে আরামে হেঁটে চলেছে। তার ইচ্ছে হল জিনিসটি সে খুলে দেখে। কিন্তু তখনই মনে হল, আসবার সময় বিভীষণ বার বার বারণ করে দিয়েছে ওটি খুলতে।

সওদাগর চলতে লাগল।

কিন্তু বার বারই তার মনে হতে লাগল—এমন কি জিনিস বেঁধে দিলে?

শেষকালে কিছুতেই তার মনকে শান্ত করতে পারলে না। কাপড়ের খুঁটটি খুলে সে দেখলে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ। ভাঁজটি খুলে সে দেখলে তাতে শুধু একটি মাত্র কথা লেখা আছে—রাম।

সওদাগরের মনে হল, ওঃ, এই জিনিস!

সংগে সংগেই সে সমুদ্রের গভীর জলে ডুবে গেল।

গাধার ঘর

পাহাড়ের ওপর ছোট একখানি ঘর করে একজন লোক বাস করত। একদিন রাত্রিবেলা এল ভীষণ ঝড়। কুঁড়ে ঘরখানি মড় মড় করে উঠল।

ঝড়ের বেগ দেখে লোকটি সত্যিই বড় ভয় পেয়ে গেল। ঝড়ের দেবতা পবন। সে অনেক কাকুতি মিনতি করে পবনকে বলতে লাগল, পবন দেব, এই ঘরখানি তোমার, এটিকে ভেঙে দিও না বাবা। এটি তোমার ঘর, এটি তোমার ঘর।

ও ভাবলে পবন যদি শোনেন যে ঘরখানি তাঁর নিজের, তাহলে কিছুতেই তা ফেলে দেবেন না। কিন্তু কুঁড়েখানা তবুও মড় মড় করতে লাগল।

লোকটি ভাবলে, হনুমান তো পবনের ছেলে। ছেলের কথা শুনলে নিশ্চয়ই তাঁর মায়া হবে। তাহলে তিনি আর ঘরখানি ফেলবেন না। চীৎকার করে সে বলতে লাগল, বাবা পবন, এটি হনুমানের ঘর, এটি হনুমানের ঘর। রক্ষে কর বাবা, রক্ষে কর।

ঘর তবুও কাঁপতে লাগল ঝড়ের দাপটে।

লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে মারা গেলেন, হনুমান কত কষ্ট করে পাহাড় মাথায় করে, ওষুধ দিয়ে তাঁকে বাঁচালেন। লক্ষ্মণের নাম শুনলে পবন নিশ্চয় ঘরটি ভাঙ্গবেন না। সে বলতে লাগল, এটি লক্ষ্মণের ঘর বাবা, লক্ষ্মণের ঘর।

ঝড় আরো বেড়েই চলল।

হনুমানের প্রভু রাম। রামের কথা বললে যদি শোনে। লোকটি তখন চীৎকার করে বলতে লাগল, রামের ঘর, রামের ঘর, এটি রামের ঘর।

রাম লক্ষ্মণ হনুমান কারুর কথাই ঝড় শুনলে না। চালের খানিকটা উড়ে গেল। ঝড়ের বেগে বাকী ঘরটা মাথার ওপরই ভেঙে পড়ে দেখে নিজের প্রাণ বাঁচাতে লোকটি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

আসবার সময় বললে, যাঃ, গাধার ঘর।

লাউ কুমড়ো

হঠাৎ বাইরে কাড়া নাকাড়ার শব্দ শোনা গেল। বামুনের পরিবার কচু শাক রান্না করছিলেন। তাড়াতাড়ি নামিয়ে ছুটে বাইরে গিয়ে শুনলেন—

রাজার বাড়ি যজ্ঞি হবে আসছে পূর্ণিমায়,
তোরা কে যাবি রে আয়, তোরা কে যাবি রে আয়;
কল্পতরু হয়ে রাজা করবে রে সব দান
যার খুশী যা চাইতে পার, নাই রে অপমান।
আসছে পূর্ণিমায়—
রাজার বাড়ি যজ্ঞি হবে কে যাবি রে আয়,
তোরা কে যাবি রে আয়॥

রাজবাড়ির লোকেরা চলে গেল। বামুন গিন্নি অনেকক্ষণ তাদের পানে চেয়ে রইলেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দেখলেন তখনও বামুনের নাক ডাকছে। অনেক ডাকাডাকি করে তো তিনি বামুনকে তুললেন।

সব শুনে বামুন চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন, অ্যাঁ, রাজার বাড়ি খাবার নিমন্ত্রণ? তাহলে গিন্নি, খাওয়াটা খুব ভালই হবে, তোমাকে আগেই বলে রাখলুম।

—তোমার পিণ্ডি। বলেই রাগ করে গিন্নি চলে গেলেন রান্নাঘরে।

গিন্নির রাগ দেখে বামুন প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেন। কি হয়েছে, ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। বামুন আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বামুনের বুদ্ধিটাও একটু মোটা। আর তিনি লেখাপড়াও বিশেষ কিছু শেখেন নি। সংসারের অবস্থা বড় খারাপ। ভিক্ষে করে কোন দিন চলে, কোন দিন চলে না। অতি কষ্টে দিন যায়।

পূর্ণিমার দিন ভোর বেলাই বামুন রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির। পাড়ার লোকের কাছ থেকে একখানি ধুতি আর চাদর গিন্নি ধার করে এনেছেন। তারপর অনেক বলে কয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে বামুনকে রাজবাড়িতে পাঠিয়েছেন।

বামুন দেখলেন রাজবাড়ির বিরাট উঠানে জায়গায় জায়গায় সব জিনিস সাজানো হয়েছে। রাজা প্রত্যেকটি জায়গা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর যে যা চাইছে তাকে তাই দান করছেন।

মণি মুক্তো হীরে জহরত সোনা রূপা থরে থরে সাজানো রয়েছে। সেগুলোর দিকে বামুন ভাল করে চাইতে পারছেন না। বামুন এগিয়ে চললেন। খানিক গিয়ে দেখলেন চাল ডাল এমন কি তরি-তরকারি শাক-সবজি সাজানো রয়েছে।

সবার আগে বামুনের চোখে পড়ল দুটি জিনিসের ওপর—একটা লাউ আর একটা কুমড়ো। উঃ, কি মস্ত বড় দুটো!

এদিকে বাড়িতে বসে বসে বামুন গিন্নি ভাবছেন। রান্না বান্না বা খাওয়া দাওয়ার দিকে আজ তাঁর মন নেই। বার বারই বামুনের কথা রাজবাড়ির কথা তাঁর মনে হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, রাজা তো সবই দান করবেন। একটা হীরে অথবা একগাছি মুক্তোর হার যদি

বামুন চেয়ে আনতে পারে, আমাদের দুঃখ তাহলে জন্মের মত ঘুচে যায়।

দু চোখ তাঁর জলে ভরে উঠল। হাত জোড় করে তিনি ঠাকুরকে নমস্কার করলেন, দেখো ঠাকুর।

এদিকে লাউ আর কুমড়োতে হাত বুলতে বুলতে বামুন ভাবছেন, বামনীর রান্না কচু শাক খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। আঃ, এ রকম দুটো পেতুম, তাহলে দুদিন খেয়ে বাঁচতুম।

ঠিক সেই সময় রাজা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি চাই বলুন।

অত্যন্ত বিনীত হয়ে বামুন বললেন, আজ্ঞে, এই লাউ আর এই কুমড়োটা।

বাঘের মুখে

জগা, হরে আর গোপলা, তিন জনে ভারী ভাব। একদিন গোপলা বললে, কিচ্ছু ভাল লাগছে না ভাই।

হরে বললে, ঠিক বলেছিস রে। আমিও তাই ভাবছি কদিন থেকে বড্ড একঘেয়ে লাগছে।

জগা বললে, আমারও ভাই মনে হচ্ছে একটা নতুন কিছু করি। কি করা যায় বল দেখি।

তিন জনে মিলে অনেক যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক হল একদিন তারা চড়ুইভাতি করতে যাবে ঐ পাহাড়ের কোলে ঝরণার ধারে।

সবই ঠিক হয়ে গেল।

চড়ুইভাতির দিনে জগার আনন্দের সীমা নেই। নেচে গেয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে বনটাকে সে মাতিয়ে তুললে। হরে কাঠ কেটে ঝরণা থেকে জল তুলে আনলে আর গোপলা এক মনে রান্না করতে লেগে গেল।

জগা বললে, আঃ, আজ প্রাণটা বাঁচল।

হরে বললে, কলুর বলদের মত সেই একঘেয়ে কাজ আর ভাল লাগছিল না। আজ ভারী ভাল লাগছে।

গোপলা কোন কথা বললে না। একমনে সে প্রত্যেকের সামনে কলাপাতায় খিচুড়ি পরিবেষণ করছে।

হঠাৎ একটা বোটকা গন্ধে সবাই চমকে উঠল। এ যে বাঘের গায়ের গন্ধ, তাতে কারুরই সন্দেহ রইল না।

কাছেই ঝোপের ভেতর থেকে একটা সর সর শব্দও শোনা যাচ্ছিল। জগার এত আনন্দ এত দাপাদাপি নিমেষেই কোথায় মিলিয়ে গেল। তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে, ভাই, আমরা সব মলুম।

হরে বললে, মরব কেন? বিপদে রক্ষাকারী ভগবান আছেন। আয় আমরা সবাই মিলে তাঁকে ডাকি।

গোপলা বললে, আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই। কেন মিছি-মিছি তাঁকে কষ্ট দেওয়া, আয়, এই গাছটায় আমরা উঠে পড়ি।

আখের ক্ষেতে

—ওরে কানাই, আখগুলো যে একেবারে শুকিয়ে গেল রে।

কানাই জবাব দিলে, হুঁ।

—ওরে, জল দে, ক্ষেতে জল দে।

কানাই জবাব দিলে, সে তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমাদের মত রোজ রোজ জল দিতে আমি পারব না। এক দিনেই এমন জল দেব যে তাইতেই হয়ে যাবে।

কানাই ছিল ভয়ানক অহংকারী। নিজেকে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানও মনে করত। কেউ কোন ভাল কথা বললে সে চটে উঠত। কানাইএর এমন সুন্দর আখের ক্ষেতটা জলের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে গ্রামের কেউ কেউ কানাইকে ডেকে বলতেন। কানাই সে সব কথা তো শুনতই না, বরং উলটে দুকথা তাদের শুনিয়ে দিত। শেষকালে আর কেউ কিছু বলত না।

কানাই একদিন মনে মনে ভাবলে, এমন কিছু করতে হবে যে সকলের একেবারে তাক লেগে যায়। পরদিন খুব ভোর বেলা দুটি মুড়ি খেয়েই কানাই লেগে গেল তার ক্ষেতে জল ছেঁচতে।

কানাইএর গায়ে ছিল অসুরের মত শক্তি আর খাটতেও পারত সে খুব। দুপুর বেলা সেখানে বসেই দুটি পান্তা খেয়ে নিলে, তারপর লেগে গেল জল ছেঁচতে। অন্যান্য লোকেরা চার দিনে যা না করতে পারে, কানাই একদিনেই তা করবে। তখন গ্রামের লোক তার সত্যিকার কদর বুঝতে পারবে।

সারাদিন জল ছেঁচা হল। সন্ধ্যার সময় কানাই ভাবলে, এবার তার ক্ষেতে গেলেই দেখতে পাবে জলের যেন বান ডেকেছে। জল থেকে উঠে সে ধীরে ধীরে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল।

গিয়ে দেখে—ও হরি, সকাল বেলা ক্ষেতটি যেমন শুকনো খট খটে ছিল, সন্ধ্যার সময়ও ঠিক তাই আছে। কানাই একেবারে অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কি? শেষকালে খুঁজে খুঁজে বের করলে ক্ষেতের এক কোণে কতকগুলো ইঁদুরের গর্ত রয়েছে। সারাদিনের প্রাণপাত পরিশ্রম ঐ গর্তগুলো দিয়েই বেরিয়ে চলে গেছে।

উত্তম বৈদ্য

একটি ছেলের কি রকম একটা অসুখ করেছিল। ভয়ানক শক্ত অসুখ। তার মা বাবা অনেক সেবা যত্ন অনেক চিকিৎসা অনেক কিছু করলেন, কমা তো দূরের কথা, অসুখ দিন দিনই বেড়ে চলল।

কবিরাজ এসে রোগী দেখলেন ও ওষুধ দিয়ে গেলেন। ছেলের বাবা বললেন, কবিরাজ মশাই, ছেলে আমার কিছুতেই ওষুধ খায় না। ঐটিই হল তার বড় রোগ। অনেক জোর জবরদস্তি করেও আমরা তাকে ওষুধ খাওয়াতে পারি নে।

শুনে কবিরাজ বললেন, ওষুধ না খেলে তো সারবে না।

রোগীকে বললেন, খোকা ওষুধ খেও।

বলেই তিনি চলে গেলেন।

তাঁর চিকিৎসাতেও কিছু হল না দেখে বাবা আর একজন কবিরাজকে ডেকে আনলেন। সব শুনে গিয়ে তিনি রোগীর কাছে বসলেন। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, বাবা, তুমি বেশ লক্ষ্মী ছেলে। ওষুধ না খেলে কখনও রোগ সারে? একটু কষ্ট করে ওষুধ খেতে হবে। দেখবে দুদিনেই রোগ সেরে যাবে। সেরে গেলে আর ওষুধ খেতে হবে না। বাবা আমার, সোনা আমার, ওষুধ খেও।

এব ভাবে অনেক বুঝিয়ে কবিরাজ চলে গেলেন। ছেলে ওষুধ খেলে না এবং রোগ আরও বেড়ে চলল। শেষকালে তার বাবা আর একজন খুব নামকরা কবিরাজকে ডেকে আনলেন।

কবিরাজ এসে খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং বাবার মুখে সব শুনলেন। তারপর একটি বড়ি বের করে বললেন, নাও, আদার রস আর মধু দিয়ে এটিকে বেশ করে মেড়ে নিয়ে এস।

ওষুধ হাতে নিয়ে কবিরাজ বললেন, খোকা, ওষুধ খাও।

খোকা মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওষুধ আমি কিছুতেই খাব না।

—বটে, বলেই কবিরাজ রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে তাকে ওষুধ খাইয়ে দিলেন।

অল্প দিনেই রোগী সেরে উঠল। রোগীর বাবাকে আর অন্য কবিরাজ ডাকতে হয় নি।

ভূতে বাঁদরে

অনেক রকমের লড়াইএর কথা শুনেছ। ভূতে আর বাঁদরে লড়াইএর কথা কখনও শুনেছ কি? বলছি শোন।

শিব আর রামের মধ্যে একবার একটা ভয়ানক রকমের ঝগড়া হয়ে গিছল। শিব বড় না রাম বড়, এই নিয়ে ঝগড়া।

শিবের শক্তি খুব বেশী। অনেক বড় বড় অসুর তিনি তাঁর ত্রিশূল দিয়ে শেষ করেছেন। তার ওপর তাঁর দলবলেরও অভাব নেই। যত রাজ্যের সব ভূত, তারাই হল শিবের সেপাই। ভূতের সংগে কে পারবে বল?

আবার রামও ছিলেন নেহাত কম নয়। অতবড় রাবণ রাজাকে বধ করলেন, তার বংশের প্রায় সবগুলোকেই শেষ করলেন। তা ছাড়া বনে জংগলে রাক্ষস মেরেছেন তো অগুণতি। সীতাকে বিয়ে করবার সময় জনকের রাজসভায় রাম যে ধনুকখানি ভেঙে দিলেন, ওটা তো ছিল শিবেরই ধনু।

তারপর রামের সেপাই বাঁদরের দল। তারাও কি কম? সাগরের ওপর দিয়েই একটা পোল বানিয়ে দিলেন। আর হনুমানের কথা? একটা গোটা পাহাড়ই তো মাথায় করে নিয়ে এসেছিল।

দেখতে না দেখতে শিব আর রামের যুদ্ধটা বেশ জমে উঠল। যুদ্ধের দাপটে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব রসাতলে যাবার যোগাড়।

কিন্তু রসাতলে যাবার আগেই দুজনে সন্ধি হয়ে গেল। দুজনেই দুজনকে কোলাকুলি করলেন। তাঁদের মনের ময়লা কেটে গেল। দুজনে আবার আগের মতই ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল হল শিবের ভূত আর রামের বাঁদরগুলিকে নিয়েই। আজ পর্যন্তও তাদের মাঝে আর মনের মিল হল না। খিটিমিটি কিচিমিচি লেগেই আছে রাতদিন।

কল্পতরু

বনের ভেতর দিয়ে এক পথিক যাচ্ছিল। সেদিন উঠেছিল ভয়ানক রোদ, আর পথিক অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছিল। চলতে চলতে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দেখলে সামনেই খুব সুন্দর একটা বড় গাছ। বিশ্রাম করবার জন্যে পথিক তার ছায়ায় গিয়ে বসল।

পথিক ভাবলে, আঃ, ছায়ায় বসে প্রাণটা বাঁচল। এই সময় এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ যদি পাওয়া যেত।

বলতে না বলতেই সামনে এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ যেন কে রেখে গেল। পথিক তো অবাক। তার তখন দারুণ পিপাসা পেয়েছে। অত ভাববার সময় নেই। গেলাসটি হাতে নিয়েই সে চুমুক দিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলে। কি চমৎকার সরবৎ!

শোনা যায়, কল্পতরু বলে এক রকমের গাছ আছে। তার তলায় গিয়ে যা কামনা করা যায়, মানুষ তাই পায়। পথিক জানত না যে সে কল্পতরুর তলায় গিয়ে বসেছে।

পথিক ভাবলে, বড্ড ঘুম পেয়েছে। ভাল একটি বিছানা যদি এখানে পেতুম।

বলতে না বলতেই পথিকের সামনে পরিষ্কার নরম একটি সুন্দর বিছানা কে যেন বিছিয়ে দিলে। সেও তাতে শুয়ে পড়ল। তারপর তার মনে হল এখন যদি কেউ এসে আমাকে হাওয়া করত।

সংগে সংগেই একজন চাকর এসে তাকে মস্ত বড় একটা তাল-পাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। মনের সুখে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল, পথিক দেখলে বেলা আর বেশী নেই। তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল। সে ভাবলে, বেশ খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার পেলে বেশ হত।

খাবারও এল।

পেট ভরে সে খাবার খেলে। তারপর তার মনে হল, আমি তো চলে যাচ্ছি, বিছানা বাসনপত্র সব চলে যাক।

সবই চলে গেল।

পথিক চলে যাচ্ছে, ঠিক এই সময় তার মনে হল, এখন যদি একটা বাঘ আসে আর আমার ঘাড় মটকে দেয়।

পথিক দেখলে তার সামনেই মস্ত বড় একটা বাঘ, এবং সেই দেখাই পথিকের শেষ দেখা।

ভেড়া-নারায়ণ

গুরু শিষ্যকে বললেন, সকালে সন্ধ্যায় নারায়ণের চিন্তা করো।

দিন কএক পরে শিষ্য এসে বললে, গুরুদেব, কিছুতেই আমার মন স্থির হয় না। একটুখানি চিন্তা করতে না করতেই মন কোথায় চলে যায়।

গুরু বললেন, আবার চেষ্টা কর।

কিছুদিন পরে শিষ্য এসে আবার আগের মতই তার মনের অবস্থা জানালে।

গুরু জিগগেস করলেন, তুমি কাকে ভালবাস? ভগবানের চিন্তা করতে বসলে কার কথা তোমার মনে হয়?

—আজ্ঞে, একটা ভেড়ার কথা। শিষ্য বলতে লাগল, ভেড়াটাকে আমি সত্যিই বড় ভালবাসি। কচি বাচ্চা থেকে এত বড়টি করেছি। তার কথাই বার বার মনে হয়।

গুরু বললেন, তোমার ঐ ভেড়ার ভেতর নারায়ণ আছেন। এই জেনে আজ থেকে সমস্ত মন দিয়ে ভেড়ার সেবা করো। যখন ভগবানের চিন্তা করতে বসবে, তখন ঐ ভেড়াটারই চিন্তা করো।

শিষ্যটি সরল বিশ্বাসে এক মনে তাই করতে লাগল।

কিছুদিন পরেই সে তার ভেড়ার মাঝে এক জ্যোতির্ময় অপরূপ মূর্তি দেখতে পেল। তার মন দিন দিনই গভীর আনন্দে ডুবে যেতে লাগল।

দুই বন্ধু

রামাই আর বিশে দুই বন্ধু। দুজনে ভারী ভাব। একদিন রামাই বললে, চল বিশে, একটু বেড়িয়ে আসি।

বিশে বললে, তাই চল।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে তারা দেখলে এক ঠাকুর বাড়ির দাওয়ায় শতরঞ্জি পেতে অনেক লোক বসে আছে। একজন পণ্ডিত ধর্মকথা বলছেন আর সকলে শুনছে।

রামাই বললে, চল, কি বলছে একটু বসে শুনি।

বিশে বললে, দূর দূর, তুই যা। আমার ওসব ভাল লাগে না। গলির মোড়ে গান বাজনা হচ্ছে শুনেছিস তো? তুই এখানে বস গে যা, ততক্ষণ আমি ওখানে যাই।

বলেই বিশে চলে গেল। রামাইও এদিক ওদিক চেয়ে ধর্মকথা শুনতে এক পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করছেন। খানিক শুনে রামাইএর ভারী বিরক্তি লাগল। ভাবলে, কি সব সংস্কৃত বলছে বামুন ভাল লাগে না। আমি ভারী বোকা। বিশেটা বেশ। ও কেমন মজা লুটছে ওখানে।

একটা মদের দোকানে গান বাজনা হচ্ছিল। বিশে গিয়ে সেখানে হাজির। খানিক দেখবার পর মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। মদের গন্ধে গা বমি বমি করতে লাগল। মাতালদের হই হল্লা আর মাতলামি দেখে বিশের মনটা কি রকম হয়ে গেল। মনে

মনে ভাবলে, আরে রামঃ, এমন জায়গায়ও মানুষ আসে। আস্ত নরক আর কাকে বলে! রামাইটা ভারী ভাগ্যবান। ও কেমন বসে বসে ধর্মকথা শুনছে, আর আমি এই নরক দেখছি।

ঠিক সে সময় সেখানে হল ভয়ানক ভূমিকম্প। অনেক বাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রামাই আর বিশে দুজনেই বাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল। রামাইকে নরকের দূত এসে নরকে নিয়ে গেল আর দেবদূত এসে বিশেকে নিয়ে গেল স্বর্গে।

অদ্ভুত পাগল

একজন লোককে সবাই পাগল বলত। লোকটা কারুর সংগে কথা বলত না, যেখানে সেখানে পড়ে থাকত। কেউ কিছু খাবার দিলে খেত। তা সেই খাবার ভাল হোক, মন্দ হোক, আর হাড়ি ডোম মুচি মেথর যেই দিক না কেন।

একদিন দেখা গেল পাগলটা কোত্থেকে এক ঠোঙা খাবার পেয়েছে। রাস্তার এক পাশে বসেছে ঠোঙাটি হাতে নিয়ে। আবার কি আশ্চর্য, একটা কুকুরও কোত্থেকে এসে জুটেছে সেখানে, আর পাগলের একেবারে গা-ঘেঁষে বসে বসে দিব্বি খাচ্ছে। পাগলটা একবার নিজের মুখে খাবার দিচ্ছে, আবার কুকুরটাকে হাত দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে, আবার সেই হাতেই নিজে খাচ্ছে।

পাগলের কাণ্ড দেখে সেখানে লোক দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কেউ নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করে হাসাহাসিও করতে লাগল। পাগল্ তখন বললে,

নারায়ণ পাশে আসি বসে নারায়ণ
নারায়ণে আহার করায় নারায়ণ।
তোমরা হাসিছ কেন, ওগো নারায়ণ
বিশ্ব মাঝে যাহা কিছু সবই নারায়ণ॥

আমায় চিনে ফেলেছে

এক বামুনের ছিল অনেক শিষ্য। বছরে একবার করে তিনি শিষ্যদের বাড়ি ঘুরে আসতেন। শিষ্যেরা ভক্তি করে খাওয়ায়, টাকা ও কাপড় প্রণামী দেয়। ঘটি বাটি কলসি খড়ম ছাতা এগুলোও কেউ কেউ প্রণামী দেয়। তাতে বামুনের বেশ আয় হত, আর তাতেই তাঁর সারা বছরের খরচ মনের আনন্দে চলে যেত।

বামুন বড় কৃপণ ছিলেন। বুকের রক্ত দিতেও তাঁর অতটা কষ্ট হত না, যতটা দুঃখ পেতেন তিনি একটি পয়সা খরচ করবার সময়। অনেক দিনের পুরনো একটি চাকর ছিল তাঁর। বামুনের কথায় ভুলে অনেক কাল সে চাকরি করেছে, কিন্তু মাইনে পায়নি একটা কাণাকড়িও। শেষকালে বিরক্ত হয়ে সে চলে গেল। মাইনে তার অনেক জমেছিল। সেগুলো তো আর দিতে হল না। বামুন তাই মহা খুশী।

কিন্তু বিপদও হল একটা। শিষ্যদের বাড়ি যাবার সময় বামুন বুঝতে পারলেন:একটি চাকর নইলে কিছুতেই চলবে না। শিষ্যেরা কি মনে করবে। আর একজন লোককে সংগে না নিয়ে বিদেশে গেলে বুড়ো বয়সে অনেক অসুবিধেও ভোগ করতে হয়। চাকরের জন্যে বামুন চারদিকে খোঁজ করতে লাগলেন। অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, অনেক লোভ দেখালেন, অনেক পুণ্যও যে হবে, সে কথাও বলতে ভুললেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আগের

চাকরটা যাবার সময় চারদিকের লোকের কাছে বামুনের নামে অনেক নিন্দে করে গেছে। চাকরি করতে কেউ রাজী হল না।

বামুন প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারলেন, টাকা না দিলে কাউকেই তিনি চাকর পাবেন না। তিনি মহা ভাবনায় পড়লেন। চাকর রাখাও বিপদ, টাকা দিতে হবে; আবার চাকর না রাখাও বিপদ, তাহলে টাকাই আসবে না।

বুড়ো হলে কি হয়, বামুনের মনে উৎসাহ খুব। কিছুতেই তিনি দমলেন না। অনেক খুঁজে খুঁজে শেষকালে একটা লোককে তিনি চাকর ঠিক করে ফেললেন। তার সংগে চুক্তি হল—যখনই বামুন শিষ্যবাড়ি যাবেন, তখনই সে সংগে যাবে। বাড়ি ফিরলেই তার ছুটি। যত সময় সে চাকরি করবে, তার খেয়ার পয়সা, তামুক ও খাবার বামুন দেবেন। তার ওপর বছরে একজোড়া কাপড় পাবে।

চাকর বললে, কর্তা, আর একখানি গামছাও দিতে হবে।

বামুন বললেন, আরে চল চল, বামুনের সংগে অত দরদস্তুর করে না। কত পুণ্য হবে তার খবব রাখিস্? গামছার জন্যে অত জেদ করিস নি। আমি যা করব, তোর ভালই জন্যেই করব। আমি যা দেব, কম পাবি নে। চল চল, আর কথা বলিসনে।

লোকটি রাজী হয়ে গেল।

সে ভাবলে, সময়টা এখন মন্দাই তো যাচ্ছে। কাজ কর্ম তেমন নেই। বামুনের সংগে গেলে খাওয়াটাও তো বাঁচবে। সে আরও ভাবলে, বামুনরা হলেন দেবতা। তাঁদের সেবা করবার সুযোগ পাওয়াও তো ভাগ্যের কথা।

কিন্তু তার মনে একটা খটকা লাগল। বললে, কর্তা, আমি যে জাতে মুচি।

—মুচি তাতে কি হয়েছে। বামুন বললেন, জানিস, বামুনরা হলেন জাতের সেরা। বামুনরা যেন আগুন। আগুনকে কেউ ময়লা করতে পারে না। আবার আগুনের কাছে যে যাবে, তাকেই পুড়িয়ে দেবে। বামুনকে কেউ অপবিত্র করতে পারে না। আবার বামুনের কাছে যে থাকবে, সেও পবিত্র হয়ে যাবে।

তারপর গলা খাটো করে আস্তে আস্তে বললেন, আরে, তুই তো দেখছি ভারী বোকা। কে তোকে জাতের কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে? আর জিজ্ঞেস করলেও, তুই যে মুচি সেকথা বলতে যাবি কেন?

মাথা নেড়ে সে সায় দিলে, হ্যাঁ কর্তা, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর একটা কথা আমি ভাবছি, আমি মুচি। সারা জীবন জুতা সেলাইয়ের কাজই তো করেছি, আপনার সেবা কি আমি করতে পারব?

বামুন বললেন, সে তোর ভাবতে হবে না। সব আমি ঠিক করে নেব।

কোন্ কাজটি কি ভাবে করতে হয়, দিন কএক ধরে বামুন তাকে

একটি একটি করে শিখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, শোন আজ থেকে তোর নাম নিতাই দাস।

নিতাই দাস মহা খুশী।

তারপর একদিন অনুগত ভৃত্য শ্রীমান নিতাই দাসকে সংগে নিয়ে বামুন তাঁর শিষ্যদের আশীর্বাদ করতে বেরিয়ে প'ড়লেন। বামুন চলেছেন আগে আর নিতাই পেছনে। নিতাইএর হাতে বামুনের কাপড়ের পোঁটলা, হুঁকো কলকে, ছাতা এইসব। যেতে যেতে বামুন বিশ বার সাবধান করে দিলেন, বাবা নিতাই, আমাকে ডুবাস নি বাবা, তোর জাতের কথা কারুর কাছে বলিস নি যেন।

নিতাই বললে, কর্তা, আমি তেমন ছেলেই নই।

যেতে যেতে তাঁরা একটা মস্ত বড় মাঠ পার হয়ে গেলেন। বড্ড রোদ। বামুন বললেন, আয়, ঐ গাছতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিই।

নিতাই দেখলে তার মামা কোত্থেকে একখানি মস্ত বড় চামড়া নিয়ে বাড়ি ফিরছে। সে যে নিতাইএর মামা, বামুন তা জানেন না। বামুনকে দেখে মামা একপাশে সরে দাঁড়াল। নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে নিতাই তার মামার দিকে চাইতে লাগল। ভাবখানা এই—তোরা মুচি। আমি এখন আর তোদের মত ছোট জাত নই। আমি এখন বামুনের চাকর। তোরা ছোট জাত, ছিঃ।

তারপর মামাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে লাগল, কর্তা, যা গরম, আপনার জন্যে নদী থেকে এক ঘটি জল নিয়ে আসব? পিপাসা হয়েছে? না তামুক সেজে দেব বলুন।

বামুন বললেন, হ্যাঁ একটু তামুকই সেজে দে বাবা। এই গাছতলায় বসে একটু তামুকই খাই।

রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে মামা তার ভাগনের পানে চেয়ে রইল। কি ভাবলে কি জানি, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল।

নিতাই দাস মনে মনে ভারী খুশী।

তুপুরের কাছাকাছি তাঁরা এক শিষ্যের বাড়ি পৌঁছলেন। গুরুকে দেখে বাড়িতে হই চই পড়ে গেল। একটু বিশ্রাম করেই বামুন স্নান করতে চললেন, যাবার সময় তিনি সকলকে ডেকে বললেন, দেখ, আমার চাকরটার নাম নিতাই দাস। একটু বোকা হলেও লোকটা বড় ভাল। তোমরা সবাই তাকে একটু দেখো।

স্নান সেরে বামুন পুজোয় বসেছেন।

পথে নিতাই বেশ ছিল। শিষ্যবাড়ি আসবার পর থেকে তার মনে কেমন যেন ভয় করতে লাগল। বার বারই তার মনে হতে লাগল—সে না হয় নাই বললে। কিন্তু সে যে জাতে মুচি, বাড়ির লোকেরা যদি কোন রকমে তা টের পায়!

নিতাই ভাবলে, বাড়ির লোকেরা তার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে তাকে আর আস্ত রাখবে না।

বামুনের কাপড়খানা নিতাই রোদে দিলে। চটি জোড়াও সাফ করে রোদে দিলে।

খানিক পরেই হঠাৎ এল জল। নিতাই ছুটে গিয়ে বামুনের কাপড়খানি তুলে আনলে। তাড়াতাড়িতে জুতো আনতে সে ভুলে গেল। জুতো জলে ভিজছে, দূর থেকে বাড়ির কর্তা তাই দেখে নিতাইকে ডেকে বললেন, ওরে নিতাই, জুতো আন।

আমায় চিনে ফেলেছে

নিতাই ভাবলে, বাড়ির সব লোক থাকতে আমাকেই বা জুতো আনবার কথা বললে কেন ? নিশ্চয়ই ওরা আমায় চিনে ফেলেছে। তখন বেশ জল হচ্ছে। ঠাকুরঘরের কাছে দৌড়ে গিয়ে নিতাই বললে, কর্তা গো আমায় চিনে ফেলেছে। আমি চললুম।

বলেই, দে ছুট।

হাতী কেমন

একটি দুটি অন্ধ লোক প্রায় সব গ্রামেই দেখা যায়। কিন্তু এক গ্রামে বাস করত পাঁচ জন অন্ধ। আরো আশ্চর্য, সবাই ছিল তারা প্রায় সমবয়সী।

এই পাঁচ জনে ছিল ভারী ভাব। পথের ধারে বসে তারা মাঝে মাঝে 'অন্ধ জনে দয়া কর' বলে ভিক্ষে করত। আবার কখন কখন বটগাছ তলায় বসে মনের আনন্দে গল্প গুজব করত।

এই অন্ধদের নাম জানবার আমাদের কি দরকার। এক দুই তিন এ রকম করেই এস আমরা অন্ধদের গল্প বলি।

তারপর একদিন অন্ধেরা গাছতলাটায় বসে খুব গল্প জমিয়েছে। ঠিক সেই সময় গ্রামের উত্তর দিক থেকে একটা সোরগোল শোনা গেল। অন্ধেরা চোখে দেখে না, কিন্তু কানের শক্তি তাদের একটু বেশীই থাকে।

অন্ধেরা কান পেতে শুনতে লাগল। এক বললে, ওরে ভাই বোধ হয় হাতাহাতি লড়াই লেগেছে।

দুই বললে, দূর বোকা, হাতী আসছে, হাতী আসছে।

সবাই তখন খুব মন দিয়ে শুনে বুঝতে পারলে, সত্যি সত্যিই হাতী আসছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাই আনন্দে চীৎকার করছে, হাতী আসছে, হাতী আসছে।

তিন বললে, ওরে ভাই, হাতী তো জন্মে কখনও দেখিনি, কাছে আসুক। হাতীটা কিন্তু দেখতে হবে।

সবাই বললে, হাতীটা দেখতে হবে।

ধীরে ধীরে সোরগোলটা এগিয়ে আসতে লাগল। কাছাকাছি এসে পড়েছে টের পাওয়া মাত্রই অন্ধেরা সব দাঁড়িয়ে পড়েছে আর চীৎকার করছে, ওগো, আমরা হাতী দেখব। আমাদের একবারটি দেখিয়ে নাও।

অন্ধদের আগ্রহ দেখে গ্রামের লোকেরা মাহুতকে অনেক অনুনয় করে বললে, ওগো তোমার হাতীকে একবার ওদের সামনে থামাও। ওরা হাতী দেখবে।

হাতী থামিয়ে মাহুত বললে, এরা তো অন্ধ। কি করে দেখবে শুনি। চোখ তো নেই, কান না নাক দিয়ে দেখবে ?

এক জবাব দিলে, না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, একবারটি তোমার হাতী থামাও। আমরা হাত দিয়ে দেখব।

হাতী থামালে মাহুত। যারা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ডেকে মাহুত বললে, ওগো, তোমরা এক এক জনে অন্ধদের এক এক জনকে ধরে হাতীর কাছে নিয়ে এস। এরা হাতীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখুক। তোমরা কিচ্ছু ভয় করো না। হাতী আমার খুব ভাল। যত সময় আমি ওপরে আছি কাউকে কিছু বলবে না।

অন্ধেরা হাতীর চারপাশে দাঁড়িয়ে হাতীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। অন্ধেরা এই রকম করেই দেখে।

একটু দাঁড়িয়ে হাতী চলে গেল। ছেলেমেয়ের দল হই হই করতে করতে পেছনে ছুটে চলল। গ্রামের লোকেরাও নিজের কাজে চলে গেল। তখন গাছতলায় আবার বসল অন্ধদের মজলিস। হাতীর গল্প চলল।

এক বললে, ভাই, আজ হাতী দেখলুম। তবে লোকে হাতীর কথা এত বলে কেন? এমন কি আর অদ্ভুত জিনিস ভাই, বল না। হাতি তো দেখলুম মুলোর মতই। তবে হ্যাঁ, মুলোর চাইতে অনেক শক্ত আর পালিস বটে।

দুই বললে, দূর দূর, এই বুঝি হাতী দেখেছিস? হাতী হয়েছে কুলোর মত।

এ লোকটা হাতীর কানে ধরেছিল।

তিন বললে, দূর বোকা, হাতী দেখেছিস না তোদের মুণ্ডু দেখেছিস। হাতী হল থামের মত।

চার বললে, থামের মত না তোর মাথা। হাতী হল দড়ির মতই অনেকটা। তবে দড়িটার গায়ে অনেকগুলো ছুঁচ রয়েছে ভাই।

এ লোকটি হাতীর লেজ ধরেছিল।

তখন পাঁচ বললে, তোরা এক একটি আকাট মুখ্যু। ভগবান তোদের অন্ধ করেছে। এত সময় চুপটি করে আমি শুনেই যাচ্ছি, মুখে কিছু বলি নি। আমি নিজে দেখলুম হাতী একটা মস্ত জালার মত। তবে ঐ চার যা বললে, জালার গায়ে সত্যি কতকগুলো ছুঁচ রয়েছে। কিন্তু জালাটা কি করে চলে ভাই, তাই ভাবছি।

তখন পাঁচটিতে মিলে চলল ভয়ানক তর্কাতর্কি। তারপর চেঁচামেচি এবং সকলের শেষে মারামারি। গ্রামের মণ্ডল সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পঞ্চ পাণ্ডবের চীৎকার আর দাপাদাপিতে সে সেখানে ছুটে এসে বললে, হেই, তোরা থাম। কি হয়েছে বল দেখি। এ রকম করছিস কেন?

মণ্ডলের গলার আওয়াজ পেয়ে অন্ধেরা থামল। তারপর একে একে সকলের কাছ থেকে সব ব্যাপার জেনে বললে, তোরা কেউ হাতীর দাঁতে, কেউ কানে, কেউ পায়ে, কেউ ল্যাজে, আবার কেউ পেটে হাত দিয়ে দেখেছিস। হাতী একটা মস্ত জানোয়ার। তোরা প্রত্যেকে যা দেখেছিস, তা সত্যি। তোদের সকলে মিলে হাতীর যেটুকু দেখেছিস, সত্যিকার হাতী তার চাইতেও অনেক বড়।